স্নেহের-বাঁধন

শ্রীগোপাল চন্দ্র দত্ত প্রণীত

[বৈশাখ ১৩২৭]

প্রকাশক—

সাধনা লাইব্রেরী

২৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট্

কলিকাতা

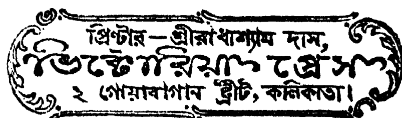
মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর শেঠ
সাধনা লাইব্রেরী
২৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত

প্রেমের দেশ

(যন্ত্রস্থ)





—"এ কি হ'ল? এ যে বড় সরু হ'ল। এ আমার চাই না। তুমি নিজে গেঁথেছ তুমি নিজে পর।" [পৃঃ ১২৮

স্নেহের-বাঁধন

প্রথম পরিচ্ছেদ

"কেমন আছ মা!" বলিয়া একটী সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা তাহার চারি বৎসর বয়স্ক ভ্রাতার সহিত রুগ্ন মাতার বিছানার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মাতা তখন জ্বরে অঘোর-অচৈতন্য; কন্যার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। বালিকা অতি ধীরে ধীরে রোগিণীর শিয়রদেশে আসিয়া অতি করুণস্বরে বাষ্পাকুলনয়নে আবার কহিল— "মা, শুন্‌তে পাচ্ছ না, আজ তেমন কথা কচ্ছ না কেন মা! তোমার কি বড় কষ্ট হচ্ছে?"

এবার মাতা কথা কহিলেন। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া সস্নেহে বলিলেন—"কে, শেফালী!" শেফালী শিয়রে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পশ্চাতে তাহার ভ্রাতা এক হাতে দিদির একটা হাত ধরিয়া অন্য হাতে মেঝের উপর এক টুক্‌রা মিছারী পড়িয়াছিল, তাহাই লইবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

শেফালী কহিল—"হ্যাঁমা, আমি তোমায় কত ডাক্ছি, তুমি কি শুন্‌তে পাও না ?"

মাতা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন—"শচী কোথায় শেফালি ?"

শচী তখন লেহনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল হঠাৎ সে স্থলে তাহার নাম উল্লেখ হওয়ায় শচী তৎক্ষণাৎ তাহার মাতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আধ আধ স্বরে কহিল—"মা মিচি।"

শচীর ভাষায় "মিচি" অর্থে মিছারী।

মাতা স্নেহভরে পুত্রের বদন চুম্বন করিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুই অপাঙ্গ দিয়া দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। শেফালী তাহা দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধস্বরে কহিল,—"কাঁদ্‌ছ কেন মা !"

মাতা শক্তি না থাকিলেও যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন—"ও কিছু নয় মা ! চোখে একটা কি পড়্‌লো তাই জল বেরুচ্ছে।"

শেফালী ভ্রাতাকে তুলিয়া লইয়া শয্যার উপর বসিল এবং ধীরে ধীরে জননীর কপোলদেশে হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাতা পুনরায় কহিলেন—"শেফালি ! একটা গল্প শুন্‌বি ?"

বাস্তবিকই শেফালী গল্প শুনিতে খুব ভালবাসিত। গল্পের নাম শুনিয়া সে আর একটু সরিয়া আসিয়া বলিল—"শুন্‌বো।"

মাতা তখন গল্প আরম্ভ করিলেন—"এক মেয়ে আর তার এক ছোট ভাই ছিল। তাদের মায়ের একদিন খুব অসুখ করেছে—এত অসুখ করেছে যে সে আর বাঁচ্‌বে না——"

শেফালী। ওকি গল্প!

মাতা। কেন?

শেফালী। মায়ের অসুখ কেন?

মাতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কেন? এমন কি হ'তে নেই? এই আমার খুব অসুখ করেছে আমি যদি না বাঁচি!—"

শেফালী। না, তাহোলে আমরা কার কাছে থাক্‌বো, কে আমাদের খেতে দেবে?

মাতা। কেন, তোমার বামণ দিদি!

শেফালী। সে বুঝি খেতে দেয়? সে তো রাঁধে।

খাওয়ার কথাটা শুনিয়া শচীশচন্দ্রের বুভুক্ষাটা একটু জাগিয়া উঠিল—সে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে নামিয়া পড়িয়া কহিল—"মা, ভাত—যাই!"

শেফালি। যা, বামণদিদির কাছে, ভাত দেবে এখন।

শচী চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে গৃহে একটী যুবক প্রবেশ করিল। বয়স—প্রায়

ত্রিংশৎবর্ষের অধিক হইবে না। স্থূলদেহ—শ্যামবর্ণ দেহযষ্টি। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিই যেন বেশ দৃঢ়ভাবে গঠিত—অথচ দেখিলে বোধ হয় যেন কোনও দুর্ভাবনায় ইদানীন সেগুলি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া কোন কথা কহিবার অগ্রেই শেফালী বলিয়া-উঠিল—

"বাবা! মা বাঁচ্‌বে না বল্‌চে।"

কথাটা শুনিয়াই দীনেন্দ্রনাথের হৃদয়টা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল—"দুর্ পাগ্‌লি! ওকি কথা! ও কথা কি বল্‌তে আছে?"

শেফালী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"আমি কি বল্‌চি নাকি? মা'ই তো বল্‌চে।" দীনেন্দ্রনাথ সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া রোগিণীকে কহিল—"হ্যাঁগা, এ সব কি? ওই সমস্ত কথাগুলো ব'লে ছেলেদের প্রাণে একটা ভয় ঢুকিয়ে দাও কেন? আর, তোমার এমন কিই বা হয়েছে যে তুমি একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত করে বসে আছ যে এ যাত্রা আর রক্ষা পাবে না! রোগ কি কারো হয় না?"

সুষমা বুঝিয়াছিল যে তাহার এই সাংঘাতিক পীড়াই তাহার কাল হইয়াছে। প্রায় একমাস যাবৎ সে শয্যাশায়ী হইয়াছে—ইহার মধ্যে কত বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ-বৈদ্য দেখিয়াছে কিন্তু কেহই তাহার এ দুঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে সক্ষম হয়েন

নাই ;—আরোগ্য করা দূরে থাকুক কেহই এতাবৎ কালের মধ্যে কৃতান্তসম এই ক্ষয়কাশ রোগের একটুমাত্র উপশম পর্য্যন্তও করিতে পারেন নাই।

দীনেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া তাহার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রগুলি একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সুষমা ভাবিল, রোগ ত সকলেরই হয় এবং এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে তাহাও জানি—কিন্তু দীনেন্দ্রনাথের মত এমন দেবদূর্লভ স্বামী, শেফালীর মত সদ্যপ্রস্ফুটিতা শিশিরস্নাতা অমৃতময়ী কন্যা—শচীশের মত আধবিকশিত গোলাপ কোরকের তুল্য পুত্র বুঝি কাহারও হয় না। যদি অদৃষ্টক্রমে আমার হইল তবে বুঝি ভোগ করিতে পারিলাম না। একদিকে এতগুলি সুন্দর উপভোগ্য বস্তু অন্যদিকে আমি—মধ্যে প্রলয়কারী মৃত্যু! সুষমা আর ভাবিতে পারিল না—কেবল উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আবেগ অশ্রু-আকারে নয়ন-কোণ প্লাবিত করিয়া উপাধান সিক্ত করিল। দীনেন্দ্রনাথ এতক্ষণ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে সুষমার দিকে চাহিয়াছিল—ভাবিতেছিল কথাটা বুঝি বড় রূঢ় হইয়াছে তাই বুঝি কুসুমকোমলা সুষমা অশ্রু উন্মোচন করিয়া সে কষ্টের লাঘব করিল। সে সুষমার মনটা ফিরাইবার জন্য আপনিই কহিল—"সুষমা, আজ ডাক্তার কি বলে গেলেন জান?"

সুষমা অন্যমনস্কভাবে অতি ক্ষুদ্রস্বরে কহিল—"না।"

দীনেন্দ্র—"বলে গেলেন, আজ রাত্তিরে যদি আর জ্বর না

হয়—আর সেই ঔষধটা খেয়ে যদি কাশের পরিমাণ কিছু কম ব'লে বোধ হয় তাহোলে আর বড় ভয়ের কারণ নেই-বুঝ্‌লে !"

এমন সময়ে বাটীর পাচিকা বামনদিদি আসিয়া শেফালীকে কহিল "দিদি ! ভাত দেওয়া হয়েছে—খাবে এস।"

শেফালী পাচিকার সঙ্গে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

তখন সুষমা অতি ধীরে ধীরে দীনেন্দ্রনাথকে কহিল—"তুমি যতই বল—আমি কিন্তু এ বার কিছুতেই বাঁচ্‌বো না দেখো ! এই দেখ আজ আবার কি হয়েছে।" এই কথা বলিয়া সে তাহার পার্শ্বস্থ পঞ্জর দেখাইল। দীনেন্দ্রনাথ দেখিল ভিতর দিক হইতে যেন কি উঁচু হইয়া ঠেলিয়া রহিয়াছে। দীনেন্দ্রনাথ সস্নেহে হস্তসঞ্চালনে সেটি দেখিতে লাগিল। হাত দিবামাত্র সুষমা সাতিশয় যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করিল, দীনেন্দ্রনাথ হাত সরাইয়া লইয়া কহিলেন—"ও কিছু নয়।"

সুষমা কহিল—"যাক্। কখনও তোমায় কোন অনুরোধ করিনি ;—আজ আমার একটা কথা রাখ্‌বে ?"

দীনেন্দ্র সাগ্রহে বলিল—"কি, বল।"

সুষমা অতি ধীরে ধীরে স্বামীর হাত দুইখানি আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া সজলনেত্রে কহিল—"বল রাখ্‌বে !"

দীনেন্দ্র "না বল্‌লে এখন কি ক'রে বল্‌বো রাখ্‌বো কি না।"

সুষমা। "আমি আজ যাব। নিশ্চয়ই যাব। তাই—"

বিস্মিত হইয়া দীনেন্দ্রনাথ কহিল—কোথায় যাবে?

সুষমা ঊর্দ্ধদেশে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"ওই—ওখানে বাবার কাছে। বল,আমি গেলে আমার শচীকে দেখ্‌বে—আমার শেফালীকে কাছে কাছে রাখ্‌বে! তারা যখন "মা" "মা" বলে কাঙ্গালীদের মতন বাড়ীময় আমায় খুঁজে বেড়াবে—তখন আমার হ'য়ে তাদের সান্ত্বনা দেবে! বল, আমার বাছাদের গায়ে কখনও হাত তুল্‌বে না!"

এইটুকু বলিতেই তাহার বাষ্প রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—আর সে বলিতে পারিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল—"বল, আমার কথাগুলি রাখ্‌বে!"

তখন দীনেন্দ্রের আয়তলোচন দুইটী জলে ভাসিতেছিল—সে ভূমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কেবল বলিল—"রাখ্‌বো। কিন্তু এখন সে সব কথা কেন সুষমা?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পরে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় বৃক্ষপত্র সকল এখনও বেশ সিক্ত রহিয়াছে—গাছের ডালে বসিয়া পক্ষীকূল পক্ষবিধূনন শব্দ করিতেছে। ক্বচিৎ দুই একটা শৃগাল সেই সকল গাছের তলা দিয়া যাইতেছে—জল এবং বৃক্ষের পত্র এতদুভয়ের উপর তাহাদের পদ পতিত হওয়ায় একরূপ অস্ফুট শব্দ হইতেছে। পার্শ্বে ধূমাবতী নদী কল্লোল-মুখরা হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছে—তাহাতে কত ছিন্ন বৃক্ষপত্র, কত ভগ্ন বৃক্ষশাখা, তৃণ ভাসিয়া যাইতেছে। গ্রামটীর নাম চন্দ্রহাট। শিক্ষিত লোক মাত্রেই গ্রামখানিকে উক্ত নামে অভিহিত করিত—নিম্নস্থ কৃষাণ জাতীয় লোক উক্ত গ্রামকে সচরাচর চাঁদের হাট বলিত। এই গ্রামেই দীনেন্দ্র নাথের বাস। গ্রাম্যপথ একেবারে জনশূন্য! প্রকৃতি যেন নীরবতার আবরণে সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন করিয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে! কতক্ষণ পরে দেখা গেল নদীর ধার দিয়া ধার দিয়া যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে সেই রাস্তা ধরিয়া দুইটী ভদ্রলোক আসিতেছেন। এক ব্যক্তির হস্তে একটী লণ্ঠন অপর ব্যক্তির হস্তে একটি ছত্র।

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে কহিলেন, "আমি তা' পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলুম।"

"তবে কি না জানেন স্পষ্ট কথাটা বল্‌লে পাছে আপনারা কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে একটা গণ্ডগোল বাধান, তাই আর সেটা বলিনি।"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "তবে কি আর কোন আশা নেই?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি—"আশা নেই কেন? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ্! একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্‌তো! তারপর যা হয় তাই হবে। চিকিৎসার তো কিছু ত্রুটি হয়নি।—"

প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বাধা দিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"ডাক্তার বাবু! আপনার পায়ে ধর্‌ছি—যে কোন উপায়ে হোক এ যাত্রা তাকে আপনাকে রক্ষা কর্‌তেই হবে। যত টাকা লাগে আপনি বলুন আমি তা' এখনি দিতে প্রস্তুত আছি। আমার বাড়ীর একখানি ইট শঙ্কা করে আমি চিকিৎসা কর্‌বো!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। "ওহে, পয়সায় যদি রোগ আরাম হ'ত তা'হোলে আর কুইন্ ভিক্টোরিয়া মারা যেতেন না।"

প্রথম। "কি হবে ডাক্তার বাবু!"

দ্বিতীয়। "আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? চাণক্য বলেছেন, বিপদি ধৈর্য্যং, অভ্যুদয়ে ক্ষমা, সদসি বাক্‌পটুতা——"

প্রথম। "অনুগ্রহ করে একটু জোরে চলুন; বোধ হয় গিয়ে আর দেখ্‌তে পাবেন না।"

কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা দীনেন্দ্রনাথের বাটীর প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রথম ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিল—"বামন মেয়ে! দোরটা খোল।"

বামন মেয়ে ঝটিতি দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিয়া সাগ্রহে কহিল, "ডাক্তার বাবু এসেছেন বাবাঠাকুর!"

দীনেন্দ্রনাথ "হুঁ্যা" বলিয়া ডাক্তারের সহিত সুষমার কক্ষে প্রবেশ করিল।

দীনেন্দ্রনাথের বাটীর পার্শ্বে একজন বর্ষীয়সী বিধবা বৃদ্ধা বাস করিতেন। তিনি দীনেন্দ্রনাথের পিতাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন; সেই হিসাবে দীনেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পিসিমা বলিত। সুষমা শয্যাশায়ী হওয়া অবধি এই বৃদ্ধা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া পরিচর্য্যা করিতেন এবং আবশ্যক হইলে নিয়মিত ঔষধাদি পান করাইতেন। তবে ইহার পূর্ব্বে যে একেবারে আসিতেন না এমন কথা বলিতেছি না। তবে সুষমা রোগাক্রান্তা হওয়া অবধি দীনেন্দ্রনাথের ভবনে তাঁহার আগমন প্রায়ই হইয়া আসিতেছে।

দীনেন্দ্রনাথ সুষমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও

ভীত হইয়া কহিল "পিসিমা! একি? এত রক্ত কোথা থেকে এল?"

বৃদ্ধা সজল-নয়নে বলিলেন—"আর কেন বল বাবা, এই দেখ বৌমা আমার কাশ্‌তে কাশ্‌তে হঠাৎ এতটা রক্ত বমি ক'রে ফেলে কেমন যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে। আর আমার বাছার বাঁচবার ধারা নেইরে যাদু আর আমার বাছার বাঁচ্‌বার ধারা নেই!"

ডাক্তার মহাশয়ও যেন কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, হস্তস্থ ছাতাটি ঘরের এককোণে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কহিলেন—"সে কি? রক্তবমি কি? কই দেখি দিখি।" এই বলিয়া তিনি রোগিণীর বিছনায় উপবেশন করিলেন এবং আপনার জামার পকেট হইতে জ্বর পরীক্ষার যন্ত্র বাহির করিয়া সুষমার বগলে দিলেন। সুষমা তখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া দেখিতেছিল একদিকে স্বর্গ—অন্যদিকে নরক! একদিকে হিন্দুর সামনিনাদিত আশ্রমের মত প্রেমের রাজ্য, অন্যদিকে পুতিগন্ধময় নরকের মধ্যে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত মনুষ্যমূর্ত্তি! সুষমা দেখিতেছিল—একদিকে মন্দার-চুম্বিত আবর্ত্তশতসঙ্কুলা মন্দাকিনীর স্রোত—অন্যদিকে নাগ-নাগিনী-সেবিতা ভোগবতীর উচ্ছল প্রবাহ! সুষমা দেখিতেছিল, একদিকে পিতামাতার ত্রিদিবস্থ রত্নবেদী—অন্যদিকে শেফালী-শচীর স্বহস্ত নির্ম্মিত বালুকাস্তূপ! একদিকে কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান, অন্যদিকে প্রেম-স্নেহ-মমতা! সুষমা দেখিতেছিল—একদিকে পূর্ণজ্যোতির

অমল-ধবল-কিরণ—অন্যদিকে "মা" "মা" রবে আকুল ক্রন্দন। তাহার জ্ঞান ছিল না। কেবল ভাবিতেছিল কোথায় যাইতেছি!—

ইত্যবসরে ডাক্তার জ্বরপরীক্ষা যন্ত্রটী সরাইয়া পরীক্ষার্থ আলোর নিকটে গেলেন—কি দেখিলেন জানি না—তবে তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল; তিনি অতি ভীতভাবে বলিলেন—"ইস্!"

তারপর আর লিখিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না, এ দুঃখের কাহিনী যত শীঘ্র পারি শেষ করিয়া দিব।

এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইল। তারপর সহসা সুষমা উঠিয়া খট্টাঙ্গের পার্শ্বে মুখ ঝুলাইয়া দিয়া কাশিতে লাগিল। এবারের কাশি আর কিছুতেই থামে না। মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে—কপালের শিরা উপশিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে, ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন হইতেছে। বৃদ্ধা দ্রুতগতিতে একখানি ব্যজনি লইয়া সুষমাকে বাতাস করিতে লাগিলেন—উদ্দেশ্য মস্তক শীতল হইলে যদি কাশের কিছু হ্রাস হয়। এইবার সুষমার কাশ চিরতরে হ্রাস হইল। হঠাৎ নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইল—সুষমা আর সে নিশ্বাস লইতে পারিল না। শচী ও শেফালীকে ফেলিয়া তাহাদের মায়ার পাশ ছিন্ন করিয়া—সুষমা চিরতরে অনন্তময়ের অনন্তধামের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

দীনেন্দ্র এতক্ষণ চিত্রাপিতের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল—সুষমার

শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সে "সুষমা" বলিয়া কক্ষতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধাও অবিরলধারে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু দ্রুতগতিতে নিকটে একটা জলপাত্র পাইয়া তাহা হইতে জলসেচন করিয়া কোন উপায়ে দীনেন্দ্রনাথের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অন্য ঘরে বামনদিদির সহিত শচী ও শেফালী ঘুমাইতেছিল। দীনেন্দ্রনাথের ও বৃদ্ধার চীৎকার শুনিয়া বামন দিদি শচীকে কোলে লইয়া ও শেফালীর হাত ধরিয়া সুষমার ঘরের দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। শেফালী একটু বড় হইয়াছে—মানুষের জীবন মরণ সম্যক্ না বুঝিলেও তবু একটু আধটু বুঝিতে শিখিয়াছে। সে দেখিল পিতা গৃহতলে আলু-লায়িত কেশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন—বামনদিদিও তাহাদের দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল—তাহার আর বুঝিতে বাকী থাকিল না যে তাহার মা তাহাদের ছাড়িয়া পলাইয়াছে ; সুতরাং সেও কাঁদিতে লাগিল। সকলকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া শচী বলিল—"দিদি—বিছানা—মা যাব।"

সকলেই শোকে মুহ্যমান্। শচী যে বামনদিদির ক্রোড় হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার মৃতা জননীর শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা আর কেহ লক্ষ্য করিল না। শচী দাঁড়াইয়া সুষমার মুখের আবরণটী টানিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া অতি মৃদু-কোমল স্বরে কহিল—"মা! মেনু!"

সুষমার কাণে সে স্বর পৌঁছিল না।

শচী সুষমার মুখে হাত বুলাইয়া আবার অতি করুণস্বরে বলিল—"মা, বাবা—কাঁদ্‌চে।"

সুষমা এবারেও শুনিতে পাইল না।

হায় মৃত্যু! তুমি এত কঠিন? যে স্বর শুনিবার জন্য এক সময়ে কান এত ব্যাকুল হইয়া থাকিত—যে চক্ষু সেই স্নেহের জ্যোতিঃ দেখিবার জন্য এত উৎসুক হইয়া থাকিত—যে বাহুদ্বয় এক সময়ে সেই স্নেহের পুত্তলিকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য এত ব্যাস্ত হইয়া থাকিত—যে অধর এক সময়ে সেই নয়নরঞ্জন নন্দনের রক্তাধর দুইটী চুম্বনের প্রতীক্ষায় এত আকুল হইয়া থাকিত,—আজ সেগুলিকে তুমি একেবারে বিকৃত করিয়া দিয়াছ!—

বৃদ্ধ দেখিলেন, যে শচী মৃতাকে স্পর্শ করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সরাইয়া দিয়া বামনদিদিকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে বলিলেন। ইত্যবসরে দীনেন্দ্রনাথ শচীকে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। শচী মাতার নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া এবং পিতার ক্রোড়ে স্থান পাইয়া কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইল এবং সে একহাতে দীনেন্দ্রনাথের মস্তক ও অন্য হাতে চিবুক ধরিয়া কহিল—"বাবা, মা ম'য়ে।"

হায়রে শিশুর-হৃদয়!—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন যায়। দিন থাকে না। একটী একটী অনুপল লইয়া একটী বিপল একটী একটী বিপল লইয়া একটী একটী পল—একটী একটী পল লইয়া একটী একটী দণ্ড—আবার একটী একটী দণ্ড লইয়া একটী একটী দিন ; এইরূপ করিয়া কত দিন চলিয়া যায় কে তাহার ইয়ত্তা রাখে ? তাই বলি দিন যায় ; দিন থাকে না। এমনি করিয়াই দীনেন্দ্র নাথের দিন যাইতে লাগিল। কিন্তু আর একটী কথা, যে দিনগুলি যায় সময়ে আবার শত চেষ্টাতেও সেগুলি ফিরিয়া আইসে না কেন ? যদি ফিরিয়াই না আইসে তবে স্মৃতি রাখিয়া যায় কেন ? কেন বল দেখি ?—স্মৃতি অমর। সুখের হোক্ দুঃখের হোক স্মৃতি কখনও যায় না—যদিও যায় তবু একেবারে যায় না একটু না একটু দাগ রাখিয়া যায়। নারিকেল বৃক্ষ হইতে পত্র উন্মোচিত হইলে তাহার যেমন দাগ কখনও মিলাইয়া যায় না—নরদেহে বসন্ত বাহির হইলে—তাহার যেমন একটু না একটু দাগ থাকে—তেমনি মনুষ্য-হৃদয়ে একবার স্মৃতি-রাক্ষসী প্রবেশ করিলে তাহার চিহ্ন রাখিয়া যাইতে কখনও বিস্মৃত হয় না। সুষমার মৃত্যুতে দীনেন্দ্রনাথের হৃদয়েও তেমনি একটা দাগ রহিয়া গেল। শত চেষ্টাতেও দীনেন্দ্র আর সে স্মৃতি-চিহ্ন

মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। প্রায় একমাস অতীত হইল সুষমা ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছে—তবুও তাহার গৃহে এমন কোন বস্তুটী নাই যাহা অহরহ সুষমার অস্তিত্ব প্রমান না করিতেছে !

দীনেন্দ্র নাথ এক বড় জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করিত ; ভোর পাঁচটার সময় যাইয়া আবার সন্ধ্যা পাঁচটায় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সুষমা যে বিছানায় শুইয়া তাহার শেষে নিশ্বাস ফেলিয়াছিল সেই বিছানায় বসিয়া কাপড়-জামা ছাড়িত ; আর ভাবিত সুষমার পবিত্র-প্রেমের পূত-প্রতিমা ! সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই সুষমা তাহার কে। সে আজ বুঝিল সুষমা শুদ্ধ তাহার স্ত্রী নয়—সুষমা তাহার সর্ব্বস্ব ! সুষমা তাহার স্নেহে জননী—কারুণ্যে ভগিনী—সংসার কার্য্যে সহকারিণী ! সুষমা তাহার স্বর্গে মন্দাকিনী মর্ত্তে গাঙ্গিণী—রসাতলে ভোগবতী। সুষমা তাহার ইহকালে সহধর্ম্মিণী—পরকালে দেবরাণী। সুষমা তাহার জাগ্রতে চিন্তা—চিন্তায় ধ্যান—ধ্যানে সমাধি। সুষমা তাহার ক্ষুধায় আহার—রোগে ঔষধ—বিমর্ষে শান্তি।

এতাবৎ কালের মধ্যে দীনেন্দ্র কোন প্রকারেই হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিল না। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্রই কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া শচী দীনেন্দ্র নাথের হাত ধরিত ; দীনেন্দ্র নাথের শোক সাগর তাহাতে আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সে তখনই

হাতের ছাতাটী আপনার বগলে রাখিয়া শচীকে ক্রোড়ে ধারণ করিত—শচী একটু হাসিয়া তাহার প্রতিদান দিত! এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তখন পূর্ব্বাপেক্ষা দীনেন্দ্রনাথের শোক অনেক লঘু হইয়া আসিয়াছে; কারণ দিন যদি সমভাবে শোকরাশি বহন করিয়া আসিত, তাহা হইলে বোধ হয় এ সংসারে মানব তিলমাত্র সময়ও তিষ্ঠিতে পারিত না!

যাহা হউক, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করা অন্যায় বিবেচনায় দীনেন্দ্রনাথ শচীকে চন্দ্রহাটের কোন নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। শচী প্রত্যহ বেলা দশটার সময় ভাত খাইয়া অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিল। তবে তাহার একটী প্রধান দোষ ছিল; বাটী হইতে বিদ্যালয় পাঁচ মিনিটের পথ না হইলেও শচী এক ঘণ্টার কমে সে পথটুকু চলিতে পারিত না। বইগুলি ও শ্লেটখানি হাতে লইয়া হয়ত শচী বিদ্যালয়ে যাইতেছে—এমন সময় দেখিল যে ঘোষেরা টানাজাল দিয়া মাছ ধরাইতেছে—শচী অমনি খানিক দাঁড়াইল। নদীর ধার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল যে একখানা বড় ভাউলিয়া বিচালী বোঝাই করিয়া অনেকদূরে ভাসিয়া যাইতেছে—শচী অমনি একটু দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাহা দেখিতে লাগিল। ধূমাবতী নদীর তীরে ঘোষেদের যে বাগানবাড়ী আছে সেই বাগানবাড়ীর বেড়ায় কত ফুল

ফুটিয়া থাকে শচী সেখানে একটু না দাঁড়াইয়া যাইতে পারে না! সুতরাং শচীর বিদ্যালয়ে যাইতে প্রায়ই দেরী হয় কিন্তু পড়া-শুনা সর্ব্বাপেক্ষা ভালই করিয়া থাকে।

এই প্রকারে কোনরূপে সকলেরই দিনাতিপাত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শচীশেরও দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে একবৎসর দুইবৎসর করিয়া যথা সময়ে শচী নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা দিয়া বিদ্যালয়ের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইল। দীনেন্দ্রনাথ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল বটে কিন্তু সে বিরলে একটু অশ্রু উন্মোচন করিল—সুষমার উদ্দেশ্যে।

চন্দ্রহাট হইতে প্রায় একক্রোশ উত্তরে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। দীনেন্দ্র নাথ শচীকে সেইখানে ভর্ত্তি করিতে মনস্থ করিল। গঙ্গাধর ঘোষের সেরেস্তায় দীনেন্দ্র কর্ম্ম করিত—এবং গঙ্গাধর বাবু তাহাকে বিশেষ ভালও বাসিতেন। শচীশ প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে শুনিয়া গঙ্গাধর বাবু আনন্দিত হইয়া কহিলেন—"তা বেশ তো! তোমার শচীর সঙ্গে বোকার সঙ্গেও তো বেশ ভাব-সাব আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি; কি বল হে?" গঙ্গাধর বাধুর পুত্রের নাম বোকা। নামের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল ও প্রকৃত নাম কি তাহা আমরা বলিতে পারিব না। কিন্তু বোকা অর্থে আমরা যা বুঝি গঙ্গাধর বাবুর পুত্র ঠিক তাহার বিপ-রীত। লেখাপড়াটিতেই কেবল তাহার এই অদ্ভুত নামের সাদৃশ্য

দেখিতে পাওয়া যায়—অন্যদিকে নয়। শিক্ষক মহাশয় তাহাকে একটি শুভঙ্করীর আর্য্যা মুখস্থ করিতে দিয়াছেন—সে প্রায় আজ এক সপ্তাহের কথা—আজ পর্য্যন্ত আর তাহার সেটি মুখস্থ হইল না। তারপর, ভাল দেশী জরীপাড় কাপড় না হইলে পরিবে না, ভাল মিহি আদ্ধির পাঞ্জাবী না হইলে গায়ে দিবে না, ইংলণ্ডে প্রস্তুত এমন জুতা না হইলে পায়ে দিবে না, সর্ব্বোপরি প্রত্যহ একটি করিয়া টাকা না লইলে বিদ্যালয়ে যাইবে না। দাঙ্গা হাঙ্গামা মারামারি করিতে তাহার মতন আর একটি নাই। এক-দিন স্কুলে কি দোষ করিয়াছিল; শিক্ষক মহাশয় তাহার মস্তকে একটি "গাধারটুপী" দিয়া আধঘণ্টা দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে বোকা রাগিয়া বলিয়াছিল "আচ্ছা শালা, গুলি করে একদিন তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব।"

সুতরাং দীনেন্দ্র নাথ বোকাকে বেশ চিনিত; সে অতি ক্ষুদ্র-স্বরে গঙ্গাধর বাবুকে কহিল "তা তো বেশ কথা! তবে কি জানেন, মুড়ি মিছরীর কি একদর? আপনার ছেলে হ'ল মনিব আর আমার ছেলে হ'ল চাকর। দুজনে এক গাড়ীতে গেলে কি ভাল দেখায়?"

গঙ্গাধর বাবুও তাহাতে আর কোন কথা কহিলেন না। বোধ হয় ভাবিলেন সে তো নিশ্চয়! আমার মতন জমিদারের ছেলের সঙ্গে যদি একটা সামান্য সেরেস্তার ছেলে এক সঙ্গে স্কুলে যায় সে

বড় লজ্জার কথা! যাহা হউক, দীনেন্দ্রনাথ যথাকালে শচীশকে উক্ত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োজিত করিয়া দিল।

শচীশ এখন একটু বড় হইয়াছে; তাহার আর সে সকল বালক-সুলভ চপলতা নাই। প্রত্যহ যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া পড়িবার বইগুলি লইয়া বিদ্যালয়ে যায়। এই কয় বৎসরের মধ্যে সে এত শিখিয়া ফেলিয়াছে যে তাহার সহাধ্যায়ীরা প্রত্যেকেই তাহাকে ঈর্ষা করিত। অনেক বালক শচীকে জিজ্ঞাসা করিত—"হ্যাঁরে শচী! তুই এরি মধ্যে এমন করে পড়াশুনা কর্‌তে শিখ্‌লি কেমন করে বল্‌ দেখি!" তাহাতে শচীশ বলিত—"কেমন করে আর? মাষ্টার মশাই যা' বলেন তাই শুনি, তারপর রাস্তায় যেতে যেতে মুখস্থ কর্‌তে কর্‌তে যাই!"

বাস্তবিকই শচীশের স্মরণশক্তি অসামান্য ছিল। যাহা একবার শুনিত তাহা সে কখনও বিস্মৃত হইত না। এমন কি সে এক এক দিন তাহার পিতার কোন বাঙ্গালা চিঠিপত্র দেখিলে তাহা হইতে অন্ততঃ দুই একটাও বানান ভুল বাহির করিত। দীনেন্দ্র নাথও পুত্রের নিকট পরাজিত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিত। পুত্রের নিকট যখন পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র পরাজয় স্বীকার করিয়া ছিলেন, তখন দীনেন্দ্র নাথ শচীশের নিকট পরাজয় স্বীকার না করিবে কেন? তাহা হইলে যে "পুত্রাদিচ্ছেদপরাজয়ম্" এই মহান কবিবাক্য মিথ্যা হয়! সেই জন্যই বোধ হয় দীনেন্দ্র

নাথ এ বাক্যের অপমাননা করিতে পারিত না। হারিয়া যাইয়া দীনেন্দ্র নাথ হাসিয়া বলিত—"আর বাবা আমরা বুড়ো হয়েছি, আমাদের কি অত বানান মনে থাকে ?"

শচীশ বলিত—"মাষ্টার মশাই বলেছেন যে পড়্‌লেই মনে থাক্‌বে। আপনি একটু একটু পড়ুন না বাবা !" দীনেন্দ্র নাথ কোন উত্তর করিত না, কেবল হাসিয়া বলিত—"দাঁড়া, তোর ছেলে হয়ে জন্মাই !"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কালের অবিরাম গতিতে শচীশ যেমন বড় হইয়াছে—শেফালীও তেমনি এমন একটী অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যেটি কৈশোরও নয় যৌবনও নয় অথচ দুইয়ের একত্রীভূত সময়। আধুনিক গল্পের কোন নায়িকাকে চিত্রিত করিতে হইলে কবি কত পন্থাই না অবলম্বন করেন! কেহ বা আকাশের চন্দ্রকে কক্ষচ্যুত করিয়া আনিয়া অথবা সরোবরের প্রফুল্ল পদ্মিনীকে মৃণালভ্রষ্ট করিয়া আনিয়া নায়িকার বদনের উপর বসাইয়া দেন। তাহাতে ফল আর অন্য কিছুই হয় না—নায়িকার মুখকে পদ্ম বিবেচনা করিয়া শত সহস্র ভ্রমর আসিয়া একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—যে যাহাই বলুক আমার মতে দেখিতে তেমন শোভা হয় না। তবে যদি সেটি প্রকৃত পদ্ম হয় আর তাহাতে যদি প্রকৃত ভ্রমর বসে তবে যে সুন্দর দেখায় না এ কথা বলিতেছি না। এইরূপ কত বলিব? নায়িকা হইলেই তাহার তিলফুলের মত নাসিকা হইবে—মুক্তার মত দশনপংক্তি হইবে—গোলাপের মত রঙ হইবে—অলকদাম এলায়িত থাকিলেও ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তৃত করিয়া থাকিবে—মার্জ্জারাক্ষী হইলেও ময়ূরাক্ষী বা হরিণলোচনা হইবে—এইরূপ কত হইবে। কে তাহার ইয়ত্তা রাখে?

আমাদের শেফালীর নাসিকা তিলফুলের মত না হইলেও বেশ সরল এবং গ্রন্থিবিবর্জ্জিত। মুক্তার মত দন্ত শ্রেণী না হইলেও সে গুলি যথানিয়মে সজ্জিত এবং মলশূন্য রঙ ঠিক গোলাপের মত না হইলেও বেশ মার্জ্জিত এবং পীত-রক্তাভ। অলকদাম কাল-সর্পিণীর মত না হইলেও নিতম্বলম্বিত এবং কুঞ্চিত। নয়ন যুগল ময়ুর অথবা হরিণ চক্ষুর মত না হইলেও সে নয়নে কারুণ্যজ্যোতিঃ বিরাজিত এবং কটাক্ষবিবর্জ্জিত।

শেফালীকে দেখিয়া তাহার বয়স নিরূপণ করা বড়ই দুরূহ। আমরা শেফালীকে দেখিয়াছি—আমাদের বোধ হইয়াছে সে অতীত বাল্যা এবং অনাগতযৌবনা। কিন্তু কখনও দেখিয়াছি সে অশীতি-পর বৃদ্ধার তুল্য আবার কখনও দেখিয়াছি সে পঞ্চমবর্ষবয়স্কা বালিকা। কখনও দেখিয়াছি সে ধুলাখেলা করিতেছে আবার কখনও দেখিয়াছি সে বামনদিদির উপর রোষকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে! সুতরাং তাহার বয়স কত তাহা আপনাকে জানাইতে পারিব না, তবে এইটুকু বলিতে পারিব যে তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে।

দীনেন্দ্র নাথ অনেক চেষ্টাও করিয়াছে কিন্তু মনোমত পাত্র না পাওয়ায় এতাবৎকাল সে তাহাকে পাত্রস্থা করিতে পারে নাই। আরও, দীনেন্দ্র নাথের মনে একটা গর্ব্ব আছে যে কন্যা তাহার কুৎসিতা নহে—যেখান থেকে হউক পাত্রের সন্ধান আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে।

সম্প্রতি একটি সম্বন্ধ আসিয়াছে, নবগ্রামের চারুচন্দ্র বসুর পুত্রের সহিত। চারুবাবু একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তিনি উক্তগ্রামে একটী পাটের কারবার খুলিয়া মাসিক বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করেন। বাড়ীখানি সহরের বাড়ীর মত না হইলেও বেশ বড়—বণিয়াদী ধরণের। পূর্ব্বপুরুষগণের নির্ম্মিত ঠাকুরবাটী, নাটমন্দির, কাছারীবাটী প্রভৃতি এখনও অর্দ্ধজীর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকায় প্রমাণ হইতেছে যে চারুবাবুর পিতাপ্রপিতাদি ক্রমে উর্দ্ধতন পুরুষগণ সকলেই এক এক জন বেশ বড় জমিদার ছিলেন। তবে কালের গতিতে চারুবাবুর এখন আর সে সব কিছুই নাই; মাত্র শ'দুই বিঘা ধানজমি—গোটা দশ বার পুষ্করিণী এবং এই অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা। ইহাতেই নবগ্রামের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা চারুবাবুর এই ধ্বংসোম্মুখ অট্টালিকাকে "বাবুদের বাড়ী" বলিত। শুনিতে পাওয়া যায়, তৎস্থানীয় সংলগ্ন নয়খানি গ্রাম ইঁহাদের মৌজার অন্তর্ভুক্ত ছিল—এই জন্যই গ্রামের নাম হইয়াছে নবগ্রাম। আবার কেহ কেহ বলে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইঁহাদের কোন এক পূর্ব্বপুরুষকে এই স্থান নিষ্কর ভাবে দান করিয়া ছিলেন, তখন ইহা একেবারে নিবিড় বনে সমাচ্ছন্ন ছিল—তিনি সেই সকল বন-জঙ্গল কাটিয়া এই স্থানে এই নূতন গ্রাম নির্ম্মাণ করেন—সেই জন্য ইহার নাম নবগ্রাম।

সে যাহা হউক, চারু বাবুর বাটীতে এখনও বৎসর বৎসর

শারদীয়া পূজা হইয়া থাকে। সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন কেহই চুল্লীক্ষেত্রে স্থালী স্থাপন করে না। পাড়ার ছেলে মেয়েরা সন্দেশ খাইয়া অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়ে। ছোট বড় ইতর ভদ্র সকলে আসিয়াই চারুবাবুর গৃহ জম্‌কাইয়া বসে। সকলেরই অবারিত দ্বার! উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ পুটিকা হস্তে গৃহে ফিরিবার সময় চারুবাবুর মস্তকে অজস্র আশির্ব্বচন ঢালিয়া যায়; তাহাদের ছোট ছোট সন্তানসন্ততি বর্গ আকণ্ঠ-দধি-প্লাবিত হইয়া আলুলায়িত বস্ত্র সংযত করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করে।

চারুবাবুর এক মাত্র পুত্র শ্রীমান্ সুনীতিকুমারও পিতার যোগ্য পুত্র। রূপে-গুণে দয়াদাক্ষিণ্যে কোন অংশেই সে পিতা হইতে নিকৃষ্ট নহে। সে পূর্ব্বে কলিকাতায় পড়িত, সেখান হইতে এম, এ, পাশ করিয়া সম্প্রতি দেশে আসিয়াছে, উদ্দেশ্য নিজেদের ব্যবসায় পরিদর্শন করা এবং আত্মোন্নতির চেষ্টা।

সুনীতিকুমার সাতিশয় ধীর স্থির ও নম্র বলিয়া চারুবাবুর অনেক বন্ধুবান্ধব তাহাকে ভোলানাথ বলিয়া ডাকিতেন।

ভোলানাথকে প্রসব করিয়া তাহার জননী তাহাকে দেখিতে পান নাই। ভোলানাথ ভূমিষ্ঠ হইবার পরই তাহার মাতা ইহধাম ত্যাগ করেন। তাই বুঝি ভগবান্ কাঙ্গালিনী শেফালীর সহিত কাঙ্গাল ভোলানাথের মিলন করিতে ব্যস্ত!—

যাহা হউক, ভোলানাথের মত পাত্র পাইয়া দীনেন্দ্র নাথ আনন্দে আত্মহারা হইল। মনে মনে হরিকে ডাকিতে লাগিল যাহাতে সে শেফালীকে এমন পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে পারে।

পরে, একদিন সে আপনি চারুবাবুর বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারুবাবুও কম নহেন, ভাবি বৈবাহিককে যথাসম্ভব আদর আপ্যায়না করিয়া তিনি দীনেন্দ্র নাথের মনটি একরূপ কাড়িয়া লইলেন। দীনেন্দ্র নাথ সেই দিনই চারুবাবুকে লইয়া যাইয়া কন্যা দেখাইল।

যখন উভয়েই পাত্র ও পাত্রী মনোনীত হইল—তখন আর কি বাকি থাকে, শুভদিনে শুভলগ্নে শেফালীর সহিত ভোলানাথের বিবাহ হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ প্রায় মাসাবধি কাল হইল বামনদিদির কেমন অজীর্ণ মত রোগ হইয়াছে ; যাহা কিছু খায় ভালরূপে পরিপাক হয় না— ভাল ক্ষুধা হয় না। পিত্তের প্রকোপ বড়ই বেশী, গলার মধ্যে দিবারাত্রই একরূপ তিক্তস্বাদ অনুভব হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে যাহা আহার করে তাহার অধোগতি না হইয়া উর্দ্ধগতিই হইয়া থাকে। দীনেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় ঘোষেদের বাটী হইতে আসিয়া পা হাত মুখ ধুইয়া বাটীর ভিতরের উঠানে বসিয়া জলযোগ করিতেছে এমন সময়ে বামনদিদি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উদ্দেশ্য গৃহযাত্রার আজ্ঞাপ্রাপ্তি।

বামনদিদিকে উপস্থিত দেখিয়াই দীনেন্দ্রনাথ কহিল—"কিগো বাছা! আজ কেমন আছ ?"

বামনদিদি বলিল—"আমাদের আর থাকাথাকি কি বাবা! যখন পেটের দায়ে এসেছি তখন দু'টো রোগনাড়া হ'লে প'ড়ে থাক্‌তে হবে বইকি !"

কথাটা দীনেন্দ্রনাথের হৃদয় স্পর্শ করিল, সে কহিল—"আচ্ছা, তুমি বাড়ী যাও তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কথা

হচ্ছে কি জান?—তুমি গেলে অন্ততঃ কিছুদিন আস্‌বে না। আমাদের দুবেলা দু'মুঠো কে দেবে বল দেখি?"

বামনদিদি কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নস্বরে কহিল—"তা বুঝি বাবা! কিন্তু মানুষের শরীরে ভালমন্দ আছে তো?"

দীনেন্দ্র—আচ্ছা, যাও। কতদিন পরে আস্‌বে?

বামনদিদি—তা এখন কি ক'রে ব'ল্‌বো বল। বৌমা ভরা পোয়াতি। দুঠেঙ্গে দুটো না দেখে তো আর আস্‌তে পার্‌বো না!

বাস্তবিক বামনদিদি তাহার বৌমার জন্য যে আসিতে পারিবে না এমন নহে; আসল কথা, সুষমার অভাবে অধুনা তাহার কাজের ভার কিছু গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার শরীরটাও তত ভাল নহে। তবে প্রথমোক্ত কারণটাই প্রধান; শেষোক্তটা তাহার আনুসঙ্গিক মাত্র।

দীনেন্দ্রনাথ কথাটায় বুঝিল যে ইহা একটা ছল মাত্র। তাহার মনের ইচ্ছা নয় যে সে আর চাকুরী করে। কিন্তু কেন চাকুরী করিবে না তাহাও সে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল না। অবশেষে কহিল—"তবে কি তুমি একেবারে ছেড়ে যাচ্ছ?"

বামনদিদি চুপ করিয়া রহিল; কোন কথা কহিল না।

তখন দীনেন্দ্রনাথ জলযোগান্তর অতি গম্ভীরভাবে কহিল—"তাই বল না বাপু! অত ওজর দেখাও কেন? যাক্—একটা

কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি যখন একান্তই যাবে তখন এ মাসের এ ক'টা দিন থেকে গেলে ভাল হয় না? তোমার মাইনে পত্রও তো এক রকম চুকিয়ে দিতে হবে! আমার হাতে এখন তেমন কিছু নেই; আস্‌চে রবিবার দিন তো মাস কাবার, তোমার যা পাওনা আছে সেই দিন দিয়ে দিব—চলে যেও।"

বামনদিদি আর কোন কথা না কহিয়া আপনার কার্য্যে চলিয়া গেল।

এমন সময়ে শচীশ রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া কহিল—"বামনদিদি! ভাত দাও।"

শচীশের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া দীনেন্দ্রনাথ তাহাকে ডাকিল। শচীশ নিকটে উপস্থিত হইলে দীনেন্দ্রনাথ কহিল—"হ্যাঁরে শচী! তোদের ক্লাস্ প্রমোশন্ হয়ে গ্যাছে নয়?"

শচীশ—হ্যাঁ।

শচীশ উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষা দিয়াছে। আজ তাহার ফল বাহির হইয়াছে। তাই শচীশকে কোন এন্‌ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য দীনেন্দ্রনাথ তাহাকে নিকটে ডাকিল।

দীনেন্দ্রনাথ কহিল—"রাইনগর স্কুলে যাবি?"

শচীশ—"তা আমি কি জানি?"

দীনেন্দ্র ঈষৎ স্মিতমুখে কহিল—"তবু বল্ না।"

শচীশ ক্ষুদ্রস্বরে "আচ্ছা, যাব" বলিয়া তাহার উত্তর সারিয়া দিল।

দীনেন্দ্র—"অমন করে বল্‌লি যে! বড় দূর—সেইজন্যে?"

শচীশও হারিবার ছেলে নহে; সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"বাবা, এইটুকু রাস্তা যদি বড় দূর হয়—তবে যে আমাদের ক্ল্যাসে একটা ছেলে পড়ে তার বাড়ী কোথা জানেন? যশোর জেলা।"

দীনেন্দ্রনাথ পুত্রের অধ্যবসায় দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইল। কহিল "শচী তোকে আমি কায়মনবাক্যে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তোর লেখাপড়ায় যেন এমনি মতি-গতি থাকে!"

শচীশ কথাটায় তত ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কহিল—"বাবা এ মাসে কিন্তু আমি একটা মজা কর্‌বো! তখন কিন্তু আপনি বক্‌তে পাবেন না!"

শচীশের হঠাৎ এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া দীনেন্দ্র কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহিল "কি মজা রে?"

শচীশ—"আপনি তো এ মাসেও আমায় জলখাবার টাকা দেবেন, আমি কিন্তু জল খাব না।"

দীনেন্দ্র—"না না ও কাজ করিস্ নি! না খেয়ে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে বুঝি টাকা জমাতে আছে?"

শচীশ—"না বাবা, জমাব না; দুখে মোড়লের ছেলেকে

একটা জামা কিনে দোব। আহা বেচারী! গায়ে শুধু একটা ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি প'রে পাঠশালে যায়!"

পুত্রের কথা শুনিয়া দীনেন্দ্রনাথ অবাক! ভাবিল স্থষমা তুমি কি রত্নই আমার কাছে রেখে গেছ'! তুমি বড় ভাগ্যবতী যে তুমি শচীশের জননী।

দীনেন্দ্রনাথ বলিল—"আচ্ছা, আমি জামা কিনে দেব অথন।"

শচীশ আনন্দোৎফুল্ল নয়নে কহিল—"ঠিক দিবেন?"

দীনেন্দ্র কহিল—"হ্যাঁরে! পাগল আর কি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বামন দিদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে দীনেন্দ্রনাথের বড়ই কষ্ট হইল। তাহাকেই রন্ধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইত। ভোরের বেলা উঠিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করতঃ শচীশের জন্য যথাস্থানে খাদ্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া নিজে আহার করিয়া ঘোষেদের বাটী যাইত। বাটীতে একটী গাভী ছিল, শচীশকে তাহার জন্য বিচালী কাটিতে এবং গো-শালায় গোময়াদি মার্জ্জনা করিতে হইত। পিতা কেবল ভাত রাঁধিয়া তাহার জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া যাইত তদ্ভিন্ন সংসারের যাবতীয় কাজ একা শচীশকেই করিতে হইত। যদিও অভ্যাস নাই; কিন্তু কি করিবে? সময় মানুষকে সকলই শিখাইয়া লয়। গৃহ-মার্জ্জনা শয্যারচনা প্রভৃতি কার্য্যে শচীশের বিশেষ বুৎপত্তি না থাকিলেও তাহাকে বাধ্য হইয়া সে সমুদয় সম্পন্ন করিতে হইত।

বেলা নয়টা বাজিলে স্নান করিয়া পিতার দ্বারা সংরক্ষিত অন্নগুলি আহার করিয়া বিদ্যালয়ে যাইত; আবার বৈকালে আসিয়া সে সাংসারিক কার্য্য করিত। দীনেন্দ্রনাথের জন্য জলপাত্র ও গাত্রমার্জ্জনী যথাস্থানে স্থাপন করিয়া ধুমাবতী নদীর চরভূমিতে গরু আনিতে যাইত। এইরূপে একরূপে সুখ দুঃখে

শচীশের কৈশোরকাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। এ কষ্টের কারণ একমাত্র বামনদিদি। যদি সে এমন সময় ইহাদের পরিত্যাগ করিয়া না যাইত তাহা হইলে বোধ হয় দুগ্ধপোষ্য শিশুর এবং সংসার-জ্ঞানাজ্ঞ দীনেন্দ্রনাথের এত আয়াস হইত না। কিম্বা আজ যদি সুষমা বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় সে জীবনান্তে দীনেন্দ্রনাথের এবং শচীশের এ ক্লেশ দেখিতে পারিত না!—

যাহা হউক, শচীশ এ সকল কাজ করিতে তেমন কষ্ট বোধ করিত না। তাহার কারণ, সে বোধ হয় বুঝিত যে, সে একজন মাতৃহীন অনাথ বালক; এ সমস্ত কার্য্য সে না করিলে আর কে করিবে? অথবা বোধ হয় ভাবিত—আহা বাবা সেই ভোরের বেলা দুটী খাইয়া অন্নের চেষ্টায় যান—সন্ধ্যেবেলা ক্লান্ত হইয়া বিশুষ্কবদনে বাটীতে ফিরিয়া আইসেন—আমি যদি একটু কষ্ট স্বীকার না করি এবং বাবাকে উক্ত কার্য্য সকল করিতে হয়—তাহা হইলে তিনিই বা বাঁচেন কিরূপে? শচীশ যাহাই ভাবুক, একদিনের জন্যও সে কোন বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করে নাই।

দীনেন্দ্রনাথও যে এ বিষয় জানিত না এমন নহে; কিন্তু সে কি করিবে? আজকাল পথে পথে শত শত সামর্থবান ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একটা ভৃত্য অথবা দাসী পাওয়া

কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। নহিলে, যেমন করিয়া হউক দীনেন্দ্রনাথ একটী ভৃত্য অথবা পরিচারিকা রাখিত!

সুষমার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া যে বৃদ্ধা তাহার শুশ্রূষা করিতেন, তিনিও মধ্যে মধ্যে দীনেন্দ্রনাথের বাটীতে আসিতেন এবং অনেক কার্য্যে শচীশকে সাহায্য করিতেন। তবে দৈনিকই যে এরূপ করিতেন এমন নহে; তাঁহার নিজের অবসর মত। যাহাই হউক শচীশের তাহাতে যে সামান্যমাত্রও সাহায্য হইত না এমন কথা বলা যায় না। এইরূপে একপ্রকারে দীনেন্দ্রনাথের দিন অতিপাত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধাও যে দীনেন্দ্রনাথের সংসারে কাজ কর্ম্ম করিতেন দীনেন্দ্রনাথ তাহা জানিত। কিন্তু জানিয়াও সে তাঁহাকে কোনদিন নিষেধ করে নাই। অনেকে হয়ত বলিবেন—নিষেধ কেন করিবে? কেহ যদি অযাচিতভাবে আসিয়া গৃহকর্ম্ম করিয়া দিয়া যায় তাহাতে কি কোন আপত্তির কথা উথাপিত হইতে পারে? পারে না সত্য; কিন্তু একটা কথা, তিনি এতটা নিঃস্বার্থ উপকার করেন কেন? তাহার কারণ বৃদ্ধা দীনেন্দ্রনাথকে আপন ভ্রাতুঃষ্পুত্রের মত এবং শচীশকে আপন পৌত্রের মত দেখিতেন; তাহার পরিচয় এ আখ্যায়িকার পূর্ব্বে কিছু পাইয়াছেন।

দীনেন্দ্রনাথও যে তাঁহাকে আপন পিতৃষ্বসার মত দেখে না

তাহাও নহে। পূর্ব্বে অর্থাৎ সুষমার জীবদ্দশায় যত হউক না হউক, এখন কোন কার্য্য করিতে হইলে তাঁহার পরামর্শ না লইয়া তাহা কখনই করে না।

এটী স্নেহের শাসন। যেখানে রক্তের কোন সম্বন্ধ থাকে না—যেখানে বংশের কোন সম্পর্ক থাকে না—সেখানেও স্নেহের আধিপত্য হইয়া থাকে!

যাহা হউক, যখন এই বৃদ্ধার সহিত আমাদের এই উপাখ্যানের কিছু সম্বন্ধ আছে তখন আর তাঁহাকে বৃদ্ধা বলিব না; এইবার হইতে দীনেন্দ্রনাথের পিসিমা বলিয়া অভিহিত করিব।

যদি তাহাতে আপনাদের কোন আপত্তি থাকে, বলিবেন। নতুবা নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র আর ফিরাইয়া আনিতে পারিব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চারুবাবু শেফালীর মত পুত্রবধু পাইয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। যখন আহার করিতেন তখন শেফালী নিকটে না বসিয়া থাকিলে চলিত না—যখন দ্বিপ্রহর বেলায় আহারান্তে শয়ন করিতেন তখন শেফালী তাঁহার শিয়রে বসিয়া বাতাস না করিলে যেন তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইত; বৈকাল বেলা বহির্ব্বাটীতে যখন বন্ধু-বান্ধববর্গের সমাগম হইত তখন শেফালী পান সাজিয়া না দিলে চারুবাবু কোনমতেই বাটীর বাহির হইতেন না; এক কথায় শেফালী যাহা না করিত তাহা চারুবাবুর কোনমতেই মনোমত হইত না। বাটীর ঝি ক্ষীরোদমণি ওরফে ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি যেদিন পান সাজিত সেদিন হয় ত চূণ বেশী হইত, নয় ত খয়ের বেশী হইত. নয় ত সুপারি বেশী হইত; সুতরাং চারুবাবুর তাহা মনে ধরিত না।

পান সাজায় কোন দোষ দেখিলেই চারুবাবু পানটী হাতে লইয়া বাটীর ভিতর আসিয়া বলিতেন—"হ্যাঁরে ক্ষীরি! বুড়ো হয়ে মর্‌তে চল্‌লি এখনও ভাল করে দুটো পান সাজ্‌তে শিখ্‌লিনে! বৌ মা দুধের বালক, সে যা পারে, তুই তার শতাংশের এক অংশও পারিস্ না!"

ক্ষীরি অন্যের সুখ্যাতিটা শুনিতে বড় পছন্দ করিত না। মনে মনে বলিত—"অমন পটের ছবিটির মতন চুপ করে বসে থাক্‌লে আমরাও ভাল ক'রে পান সাজ্‌তে পার্‌তুম!" প্রকাশ্যে বলিত—"তা কি কর্‌বো বাবু! নতুন চূণ; ঠিক্‌ আন্দাজ কি করতে পারা যায়?"

শেফালী অমনি একটী রেকাবীতে কতকগুলি পান সাজিয়া চারুবাবুর সম্মুখে রাখিয়া বলিত—"এই নিন্‌ বাবা!"

এইরূপে চারুচন্দ্রের যাহা কিছু আবশ্যকীয় কর্ম্ম তাহা শেফালী নিজে অথবা সংশোধিত করিয়া না দিলে কোন প্রকারেই চলিত না।

শেফালীও বুঝিত যে চারুবাবু তাহাকে আপনার কন্যার ন্যায় দেখেন; সুতরাং যাহাতে চারুবাবু কোনরূপ অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হন এমন কাজ সে প্রাণান্তেও করিত না।

ক্ষীরি চারুবাবুর বিছানা করিয়া গেল; শেফালী আসিয়া বালিশ চাদর সমস্ত মেঝেয় নামাইয়া আবার নূতন করিয়া তাহা রচনা করিল। পাচক-ব্রাহ্মণ দুধের বাটী আনিয়া চারুবাবুর জন্য মেঝের উপর রাখিয়া ঢাকা দিয়া গেল; শেফালী আসিয়া সেটী টেবিল অথবা কোন উচ্চবস্তুর উপর রাখিয়া দিল। এইরূপে শেফালী ক্রমে ক্রমে চারুচন্দ্রের আরও প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিল।

চারুবাবুও বৌমা বলিতে অজ্ঞান! চারুবাবুর কন্যা হয়

নাই ; কন্যার বাৎসল্য যেন এতদিন শেফালীর নিকট গচ্ছিত ছিল, আজ তিনি শেফালীকে পাইয়া তাহা সমস্ত বুঝিয়া লইলেন ! কন্যার অভাবে যেটুকু এতদিন অসম্পূর্ণ ছিল আজ তাহা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠিল।

শেফালীও ক্রমশঃ বুঝিতে পারিল যে, চারুবাবুই তাহার শ্বশুর চারুবাবুই তাহার শ্বাশুড়ী। যখন তাহার শ্বাশুড়ী নাই তখন তাঁহার সেবা চারুবাবুরই প্রাপ্য ; অতএব শেফালী তাঁহাকে প্রাণপণে যত্ন না করিবে কেন ?—

একদিন বৈকালবেলা খুব মেঘ করিয়াছে। চারিদিকে গাছের পাতায় পাতায় শাখায় শাখায় মেঘের অন্ধকার ঘণীভূত হইয়া আসিয়াছে ; ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে ; সরোবরের জল কাল হইয়া আসিয়াছে ; প্রবল বাত্যাবলে অৰ্দ্ধ-মুদিতা নলিনী বিধ্বস্তা হইয়া যাইতেছে ; পুষ্করিণীর চত্বরের উপরে যে সকল বকুলবৃক্ষ আছে তাহা হইতে অবিশ্রান্তভাবে পুষ্প স্খলিত হইয়া পড়িতেছে ; পুষ্করিণীর তীরবর্ত্তী তালবৃক্ষ হইতে একরূপ অস্পষ্ট মর্ম্মর-শব্দ উত্থিত হইয়া নৈসর্গিক আন্দোলনের সহিত যোগদান করিবার প্রয়াস পাইতেছে ; পশ্চিম-আকাশে কৃষ্ণ-মেঘের নিম্নে চাতক-বধু "ফটিক্‌জল" বলিয়া ফুক্‌রাইতেছে ; এমন সময় শেফালী আপনার কক্ষের বাতায়নে বসিয়া সেইগুলি দেখিতেছে।

শুধু দেখিতেছে না তাহার সঙ্গে কত কি ভাবিতেছে। একবার

ভাবিতেছে দীনেন্দ্রনাথের কথা। হায়! তিনি এ দুর্য্যোগে কেমন করিয়া বাটী আসিবেন! আবার ভাবিতেছে শচীশের কথা—সে ছেলে মানুষ! এই তাহার স্কুল হইতে আসিবার সময়, কেমন করিয়া সে একাটী ধুমাবতীর তীর দিয়া বাটী আসিবে! এই এত ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে—সে একাটী হয়ত নদীর ধার দিয়া ধার দিয়া যাইতেছে—আহা! তাহার কত ভয় করিতেছে!

বাস্তবিকই শেফালী শচীশকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বুঝি তাই এইরূপ একটা কোন প্রাকৃতিক বিপ্লব দেখিলে যাহাকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি তাহার জন্য মনটা এত উতলা হয়! মনে হয় এরূপ সময় পাছে তাহার কোন বিপদ ঘটে!

যাহা হউক, শেফালীর আর ভাবা হইল না। কারণ তখন একটী যুবা গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে শেফালীর হাতখানি ধরিয়া অতি কোমলস্বরে কহিল—"কি ভাব্‌ছো!"

আগন্তুক ভোলানাথ অর্থাৎ সুনীতিকুমার।

শেফালী মাথায় একটু কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল—"কি আর ভাব্‌বো!"

ভোলানাথ সে কথা কিন্তু শুনিল না; কহিল—"তবু!"

শেফালী—"কিছুই না।"

ভোলা—"তা কখনও হ'তে পারে না। ভাব্‌না ছাড়া কি কখনও মানুষ আছে?"

শেফালী হাসিয়া বলিল—"আমি আছি।"

ভোলা—"তবে আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছিলে?"

শেফালী—"কেন, মেঘ।"

ভোলা—"আর।"

শেফালী—"আর কি!"

ভোলা—আর কিছু দেখ্‌ছিলে না!

শেফালী তখন কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—"ভাবছিলুম শচীনের কথা। যে দুর্যোগ! সে বাড়ীতে এসে পৌঁছিল কিনা।"

ভোলা—"শচীশের কথা ভাব্‌ছিলে, তাই সেটা আগে স্পষ্ট বল্‌লেই হত! আমার কথা তো আর ভাবনি যে গোপন ক'চ্ছ! যাক্—এখন স্বীকার কর্‌ছো যে ভাব্‌না ছাড়া মানুষ থাক্‌তে পারে না।"

শেফালী যেন হারিয়া গিয়াছে এইরূপ ভাবে কহিল—"হাঁ!"

এমন সময়ে ক্ষীরি আসিয়া বলিল—"বৌদিদি! বাবু পান চাইছেন।" ক্ষীরোদা চলিয়া গেলেন।

শেফালী কিঞ্চিৎ হাসিয়া ভোলানাথকে কহিল—"তবে বিদায়।"

ভোলানাথও তদনুরূপ স্মিতমুখে বলিল—"যে আজ্ঞা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরে কৃষ্ণ-পঞ্চমীর চন্দ্র কিরণজালে ধরণীর তমোরাশি দূর করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছে। আকাশে পিচ্ছাকৃতি মেঘের ক্রোড়ে দুই একটী তারকা মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। কদাচিৎ বকুলবৃক্ষের শাখার অন্তরালে বসিয়া দুই একটী পেচক কলরব করিয়া উঠিতেছে। দূরে ঝিল্লীগণ অস্পষ্ট রাগিণী তুলিয়া যেন কি গান করিতেছে। চারিদিক নীরব—নিথর—নিস্তব্ধ। তাহার কারণ শীতের রাত্রি। শীতকালে – বিশেষ এই রাত্রে কে আর বাহির হইবে? কালজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সময়কে বোধ হয় শীতকাল বলিবেন না—কেননা এখন ফাল্গুন মাসের শেষাংশ। তাঁহাদের মতে বলিতে গেলে বলিতে হইবে ইহা বসন্তকাল। কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারিব না—তাহার কারণ বসন্তকাল হইলেও—তাহার সহচর কেহই নাই। নব-কিসলয়, কোকিল-কোকিলা, এ সব কিছুই নাই; বরঞ্চ প্রবল পরিমাণে শৈত্যবায়ু বহিতেছে;—সুতরাং এখন আমরা এ সময়কে শীতকাল বলিব। যাহা হউক, এই শীতের রাত্রে ভোলানাথ আপনার কক্ষে পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া "শিয়ালী" নামক কে ইংরাজ-কবি আছেন তাঁহার

একটি কবিতাংশ পাঠ করিতেছে। দেখিলে বোধ হয়, পুস্তকের প্রতি পাঠকের তত মনঃসংযোগ নাই; সে যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে! কারণ তাহার আকার-প্রকার ভাবভঙ্গী সকলগুলিই যেন তাহার এ গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

এমন সময় শেফালী একডিবা পান লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। শেফালীকে দেখিতে পাইয়া বোধ হয় ভোলানাথের ভোলা মন কিছু অভিমান বোধ করিল; সে কিঞ্চিৎ নিম্নস্বরে অথচ স্মিতমুখে কহিল—"পান সাজ্‌তে কোন কষ্ট হয় নি তো? আর যদি তাইই হয়, তবে না হয় ও কাজটার ভার কা'ল থেকে ক্ষীরির হাতে দেওয়া যাবে!"

শেফালী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, সেও অনুরূপ স্বরে কহিল—"মহারাজের যদি তাহাই বাঞ্ছনীয় হয়—আর দাসীর যদি পান সাজার এই কষ্টটুকুও কোমল প্রাণে সহ্য না হয়—তা'তেই বা আমার আপত্তি কি!"

ভোলানাথ হস্তের পুস্তকখানি টেবিলে রাখিয়া কহিল—"আচ্ছা, সে বিষয় পরে বিবেচনা করা যাবে এখন! এখন এইখানে বস দেখি; একটা বড় কথা আছে।"

শেফালী শয্যার উপর বসিয়া কহিল—"বড় কথা? কত বড়?"

ভোলা - ঠাট্টা নয় ; একটা সুখবর !

শেফালী—সুখবর হ'লেই সুখ-বর হবে, কেমন ত ? আচ্ছা ব'লে ফে'ল।

ভোলা—শচীশ এন্‌ট্রান্স পাশ করেছে, শুনেছ ?

শেফালী—হ্যাঁ।

ভোলা—কখন শুন্‌লে ?

শেফালী—এই মাত্র।

ভোলা—কার কাছে ?

শেফালী—তোমার কাছে।

ভোলানাথ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল—"ইয়ারকীর কি সময় অসময় নেই ? এমন একটা আনন্দের কথা !"

শেফালী—"কি কর্‌বো বলনা, ইয়ারকী কর্‌বার সময় কই ? সারাদিন তো মশাইয়ের দেখা পাবার যো নেই ! এই এতটুকু রাত্তিরের মধ্যে যেটুকু সময় পাই তারই মধ্যে ওটা সেরে নিতে হবে তো !"

ভোলা—তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ !

শেফালী—এর আগেতো আরও ছেলেমানুষ ছিলুম ; বিয়ে কর্‌লে কেন ? যাক্, এখন পরাণের মা'র সঙ্গে সম্বন্ধ কর্‌বো নাকি ? সে খুব বুড়ো মানুষ, বন্‌বে ভাল। কিন্তু একটা কথা, তুমি যেমন এখন আমায় কথায় কথায় ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ

করো, সেও তোমাকে তেমনি কর্‌বে! তখন কিন্তু রাগ কর্‌তে পার্‌বে না। কারণ, আমি তোমার কাছে যা' তুমিও তার কাছে তা' হবে!

ভোলা বুঝিল বোধ হয় শেফালীকে ছেলেমানুষ বলিলে সে রাগ করে। তাই ভোলানাথ এবার একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিল—"শেফালী! তোমায় "ছেলেমানুষ" বল্‌লে তুমি রাগ করো?—না?

শেফালী—কার ওপর রাগ করি?

ভোলা—যে বলে।

শেফালীর একটী উত্তর জিহ্বায় আসিল। বলে কি না বলে এইরূপ ভাবিতে লাগিল। এমন সময় জিহ্বা হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া দিল—"তমি ছাড়া সকলের ওপর রাগ করি।"

ভোলানাথ বুঝিল সে ধন্য—কেননা শেফালীর মত তাহার সহধর্ম্মিণী।



নবম পরিচ্ছেদ

আজ দীনেন্দ্র নাথের পিসিমাতা রন্ধনগৃহে রন্ধন করিতে-ছিলেন। শচীশ মাতৃহীন। তাহার জন্মদিন উপলক্ষে পায়সান্ন রন্ধন করিয়া দিতে হইবে; সুতরাং এ কর্ম্ম পিসিমাতা স্বয়ই গ্রহণ করিলেন। সংসার বাঁধিয়া বাস করিতে গেলে, হিন্দুর শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে বৈকি! আজ কালকার উচ্চ শিক্ষিত দলের মত দীনেন্দ্রনাথ পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াদি হইতে বিরত হইতে চাহে না। অতএব, পিসিমাতা যেমনি বলিলেন—আজ শচীশের জন্মতারিখ—পায়সান্ন রাঁধিয়া দিতে হইবে—দীনেন্দ্র নাথও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা সম্পন্ন করিতে তৎপর হইল।

পিসিমা এতক্ষণ দাইলে কাঠি দিতে ছিলেন; অদূরে দীনেন্দ্রনাথ একখানি আসনে বসিয়া আপনার পালিত মার্জ্জার শাবককে আদর করিতেছিল। দীনেন্দ্রনাথ বিড়ালটীর গায়ে হাত বুলাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন সে দিকে যে নিবিষ্ট ছিল এ কথা বলিতে পারি না। কারণ, কিয়ৎক্ষণ পরে বিড়ালনন্দন একবার আলস্য ভাঙ্গিয়া কিছু দূরে সরিয়া বসিল; দীনেন্দ্রনাথও সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া নিকটস্থ একটা বেগুনের বোঁটা মেঝেয় ঘসিতে ঘসিতে অতি ধীরে ধীরে কহিল—"পিসিমা, আর ও সব হাঙ্গামা কেন? যখন এতদিন এক রকম

ক'রে কাটিয়ে দিয়েছি, তখন বাকি ক'টা দিনের জন্যে আবার একটা পরের মেয়েকে গলায় কর্ব্ব কেন ?"

পিসিমা হস্তস্থিত কাঠিটি নিকটে রাখিয়া এক পার্শ্বস্থ উনানে হাত ধুইয়া দীনেন্দ্রনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন এবং কহিলেন—"ওরে খ্যাপা আমি কি সাধ করে বিয়ে করতে বল্‌ছি ! একবার ভেবে দেখদিকিনি ;—আমি না হয় দুমুঠো রেঁধে দিয়ে গেলুম ;—কিন্তু সংসারের অবস্থাটা কি হয়ে আছে বুঝতে পাচ্ছিস ত !"

দীনেন্দ্রনাথ কহিল—"আমার আবার সংসার কি পিসিমা ? তবে যা ভাব্‌না, ওই ছোঁড়াটার জন্যে। তা' দুদিন পরে ওর একটা বিয়ে দিয়ে সংসারী ক'রে দেব ; আমার দিন এমনি করে একরকম সুখে-দুঃখে কেটে যাবে !"

পিসিমা কহিল—"আমি তোর পিসিমা—গুরুজন ; আমার কথা রাখ্‌—বিয়ে কর্‌ ।"

দীনেন্দ্র—"আমি তো তা অস্বীকার করিনি পিসিমা ! কিন্তু আমায় ওই অনুরোধটা করো না ।"

পিসিমা—"কেন ? তবে সংসার চল্‌বে কেমন করে ? আমি যতই করি, তবু নিজের স্ত্রীই সংসারের লক্ষ্মী ।"

দীনেন্দ্র—"না পিসিমা, আমি লক্ষ্মীছাড়া হয়ে বেশ আছি । আমায় এ অবস্থায় আর বেঁধো না ।"

পিসিমা—"বিয়ে কর্‌লেই কি সংসারে লোক বাঁধা পড়ে? জগতে কি কেউ বিয়ে করে না?"

দীনেন্দ্র—"আমিও তো করেছিলুম!"

পিসিমা—"ভাগ্যে তো আর ভোগ হ'ল না! আবার কর্‌তেই বা দোষ কি?"

দীনেন্দ্র—"দোষ নয়ই বা কি পিসিমা! প্রথমতঃ ধর,—যে আস্‌বে সে পূর্ব্বের মতন হবে না। দ্বিতীয়তঃ আমার ছেলে-মেয়েটিকে দেখে তার হিংসেয় প্রাণ জ্বলে উঠ্‌বে। তৃতীয়তঃ তাদের যত্ন না কর্‌লে তার সঙ্গে আমার প্রায়ই মনান্তর হবে; ফলে আর অন্য কিছুই হবে না, হবে কেবল অশান্তি ভোগ! কাজেই বল্‌ছি—ওর জন্যে আর আমায় কিছু ব'লো না পিসিমা।"

পিসিমা—"হিংসেয় প্রাণ জ্বলে ওঠে কাদের? যারা অসদ্বংশের মেয়ে তাদের। সৎবংশ থেকে মেয়ে আন্‌লে কি আর ও সব জ্বালা সইতে হয়?"

দীনেন্দ্রনাথ ভাবিল পিসিমা কিছুতেই ছাড়িবার পাত্রী নন। সুতরাং সে মহা ঘোর সমস্যায় পড়িল। অথচ কিছু বলিতে পারিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া—"আচ্ছা আমি এ বিষয় পরে বল্‌বো।" বলিয়া সারিয়া দিল।

দীনেন্দ্র নাথের হৃদয়ে তখন প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া তাহার অন্তঃস্থল কাঁপাইতে লাগিল। একবার ভাবিল সংসারের

অবস্থা; সত্যই ত ছিন্নভিন্ন—শ্রীহীন। আবার ভাবিল এখন যদি সংসার বজায় রাখিতে বিবাহ করি তাহা হইলে সুষমার কাছে বিশ্বাসঘাতক হই! একবার ভাবিল সংসারে থাকিতে হইলে সংসারী না হইলে চলিবে কেন; আবার ভাবিল সংসারেই যদি থাকিতে হইবে তবে সুষমার মত সঙ্গিনী কোথায় পাইব? একবার ভাবিল জগতে খুঁজিয়া দেখিনা কেন, কোথাও কি সুষমার প্রতিচ্ছবি নাই? শুধু দেখিতে দোষ কি? দেখিলেই কি বিবাহ করা হয়? এ বিশ্ব সংসারে কি একরূপ দুইটী বস্তু থাকে না? কেহ হীরক হারাইয়া হীরকের অনুসন্ধান করে—হয়ত কালক্রমে তাহা পায়; কিন্তু আমি যদি হীরকের অন্বেষণে যাইয়া কাচখণ্ড পাই?—তবে উপায় কি? চিনিব কিরূপে? কে আমায় চিনাইয়া দিবে? কে যেন বলিতেছে আমি আবার সুষমাকে পাইব। কিন্তু হায়! কোথায় সুষমা? সে এখন হয়ত অনন্ত স্বর্গে—পরীর রাজ্যে—প্রেমের পুণ্যগৃহে। আর আমি? আমি রোগ শোকের আবাস-স্থল—দুঃখদৈন্যের লীলাভূমি—পাপপুণ্যের রঙ্গমঞ্চে—সংসারে। যেখান হইতে এখান কতদূর! তবে মনে করি কেন সুষমাকে পাইব? বলিতে পার?—এ আকাঙ্খা না অতৃপ্তি? এ আশা না নিরাশা? এ হর্ষ না বিষাদ?—

দশম পরিচ্ছেদ

দীনেন্দ্র নাথ কয়েকদিন ধরিয়া এই সমস্ত ভাবিল বটে কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পিসিমাতা ঠাকুরাণী আপনিই জিজ্ঞাসা করিলেন—"দীনেন্। বিয়ের কি হবে? কিছু ঠিক কর্‌তে পার্‌লি?"

দীনেন্দ্রনাথের হৃদয় তখন ঘোর সমস্যাপূর্ণ! কাজে কাজেই কহিল—"যা ভাল বোঝ কর পিসিমা। কিন্তু শেষে যেন আমায় জীয়ন্তে মর্‌তে না হয়!"

অনেকে হয়ত বলিলেন দীনেন্দ্র নাথ নিজে না বিবাহ করিয়া শচীশের বিবাহ দিলেই তো দিতে পারে—যখন সংসারে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু দীনেন্দ্র নাথ সে কথাও ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরে দেখিল শচীশ এখন পাঠরত ছাত্র—এ অবস্থায় তাহার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে না; অথচ সংসারের একজন সহকারিণী না হইলে চলে না। কাজেই দীনেন্দ্র নাথ নিজে বিবাহ করাই সমীচিন বিবেচনা করিল।

যাহা হউক, দীনেন্দ্র নাথের কথা শুনিয়া তাহার পিসিমাতা

যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্থা হইলেন। মনে মনে হরিকে ডাকিয়া কহিলেন—"হরি! যেন মনবাসনা পূর্ণ হয়; যেন শুভকার্য্য শীগগীর হয়ে যায়; আমি তোমায় সওয়া পাঁচ পয়সার লুট দিব।"

দীনেন্দ্র নাথের বিবাহ দিবার জন্য তাঁহারই বা এত আগ্রহ কেন এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন; তবে তাহার কোন সদুত্তর পাইবেন না। আমাদের বোধ হয় দীনেন্দ্র নাথ বিবাহ করিলে তাঁহাকে মাঝে মাঝে আসিয়া যে রন্ধন করিতে হয়—সেটুকু পরিশ্রমের লাঘব হইবে। অথবা অন্য কোন কারণ আছে যাহা আমরা অবগত নহি।

দীনেন্দ্র নাথ বেশ বুঝিত, যে মৃতদার তাহার বিবাহ করা কোন প্রকারেই উচিত নয়—অবশ্য যদি কোন অপগণ্ড শিশুসন্তান না থাকে। কিন্তু তাহা জানিয়াও দীনেন্দ্রনাথ এ হেন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছে। তাহার কতকগুলি কারণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত অপর কারণ বৃদ্ধার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। যদি কোন ব্যক্তি এক বিষয় লইয়া অহোরাত্র তোমায় উত্তেজিত করে—আহারে বিহারে শয়নে গমনে, যদি ঐ একই কথার পুনঃ পুনঃ অবতারণা করে; তবে তুমি কতক্ষণ তাহার আবেদন উপেক্ষা করিতে পার? শুধু তুমি কেন—যে মানুষ—সে পারে না। আর, যে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে সে হয় নরকের কীট না হয় মনুষ্যাকারী দেবতা। সুতরাং দীনেন্দ্রনাথ

যখন মানুষ তখন সে তাহা কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিবে? কাজেই সে বিবাহে মত না দিয়া থাকিতে পারিল না।

কিন্তু মত দিয়াও সে নীরবে থাকিতে পারিল না—তাহার প্রাণের মধ্যে একটা ঘুর্ণী বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল—সে ঘুর্ণী-বায়ু প্রবাহিত হইল সুমতি এবং কুমতি হইতে।

সুমতি বলে বিবাহ করা ভাল নয়—বিশেষ যখন বিগতদার। কুমতি ঠিক তাহা বিপরীত লইয়া প্রতিবাদ করে। কেহই কম নহে;—একে অপরের সহিত এক মত না হওয়ায় যত কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে দীনেন্দ্র নাথকে। কিন্তু কি করিবে? উপায় নাই। সুমতি কুমতির কলহ ভঞ্জন করিয়া দিবার সাধ্য তোমার আমার নাই। বরঞ্চ সুমতিকে শান্ত করিতে পারিবে—তথাচ কুমতি কিছুতেই তোমার মানা মানিবে না। সুমতিকে একবার অপমানিত কর সে মরমে মরিয়া যাইবে—কিন্তু কুমতিকে তুমি গ্রাহ্য না করিয়া একধারে ফেলিয়া রাখ সে আপনি উঠিয়া আসিয়া তোমার উপর প্রভূত্ব বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যদু গোপাল সেন অতি অল্প বয়সে দুইটি কন্যা ও একটী পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহন করেন। যদুবাবু এক সওদাগরী আফিসে কাজ করিতেন—মাহিনা মাত্র তিরিশ টাকা। কাজেই কোনরূপে অতি কায় ক্লেশে পাঁচটী প্রাণীর জীবন অতিপাত হইত। পাঁচটী প্রাণীর মধ্যে তিনি নিজে, তাঁহার স্ত্রী, দুইটি কন্যা এবং একটী পুত্র। সুতরাং তাঁহার হঠাৎ এই অকাল মৃত্যুতে তাঁহার বিধবা স্ত্রীকে তিনটি নাবালক লইয়া বড়ই বিপদে পড়িতে হইল। সংসারের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় তাহা তেমন সচ্ছল নহে। দুইখানি মাটীর ঘর—এক খানিতে পাকক্রিয়া সম্পন্ন ও অন্যখানিতে শয়ন করা হয়। মধ্যে একটু আঙ্গিনা—তাহার পরে আর একটি দুই-চালা ঘর আছে—সেটী বাহিরের ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানি যদুবাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা হরিচরণের অধিকার ভুক্ত।

যদুবাবুর জীবদ্দশায় হরিচরণের আগমন হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ তাঁহার বিধবা স্ত্রীই দেন। কিন্তু ভাগ্য-দোষে হতভাগিনী আপন কন্যাকে যোগ্য পাত্রে অর্পণ করিতে পারেন নাই।

বিবাহ অবধি সুপ্রভা স্বামী কেমন তাহা সে ভাগ্যদোষে জানিতে পারে নাই। কারণ হরিচরণ একজন বিখ্যাত গঞ্জিকা-সেবী। দিন রাত্র গঞ্জিকা সেবন করিয়াই পড়িয়া থাকে। খাইবার সময় হইলে সুপ্রভার ভ্রাতা আসিয়া ডাকিয়া লইয়া যায়। হরিচরণও একবার মাত্র বাড়ীতে গিয়া তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া লইয়া আবার চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া প্রবেশ করে। চণ্ডীমণ্ডপই তাহার আশ্রয়—পেচক দিবাভাগে বহির্গত হয় না—হরিচরণ দিবা রাত্র কোন সময়েই নয়।

যদু বাবুর সাহেব তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। কাজেই তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। অমনি বেয়ারার হাত দিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া দিয়া কহিলেন—"যাও, যদুবাবুর স্ত্রীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, কত হইলে তাঁহার চলে।" যদুবাবুর স্ত্রী বেয়ারাকে বলিয়া দিলেন—"আমি কি বল্‌বো। প্রভু নফরকে যা দিয়ে সন্তুষ্ট হন তাই দিবেন।"

শুনিয়া সাহেব বড় প্রীত হইলেন। সেই অবধি তিনি যদুবাবুর স্ত্রীকে মাসে মাসে কুড়িটা টাকা মণি অর্ডার করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন—এবং যদুবাবুর স্থানে তাঁহার পুত্রকে মাসিক পনের টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া লইলেন। ইংরাজ হৃদয়ের উদার পরিচয় এইখানে!

যাহা হউক, যদি সাহেব এরূপ না করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় এই কয়টি প্রাণীকে একরূপ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইত !

হরিচরণের পিতামাতা কেহ ছিলেন কিনা জানিনা ; কারণ বিবাহের কিছুদিন পর হইতেই সে যদুবাবুর সংসারেই পালিত হইয়া আসিতেছে। কোন চাকুরী করিত না—তবে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া দুই চারিটা ছেলে পড়াইত—তাহাতেই তাহার হাত খরচ চলিয়া যাইত। বেশী কিছু পাইত না কিন্তু পাইবার আশা করিত। কে না করে ?

কায়স্থের ছেলে—ভদ্রলোকের ছেলে—এরূপ ভাবে ঘৃণিত ইতরলোকের মত থাকিলে কি ভাল দেখায় ? এইরূপ বলিয়া সুপ্রভা কত বুঝাইয়াছে ; কিন্তু সে একটি কথাও কানে তুলে নাই। নেশা যে মানবকে বধির করে ! এখন আর সে তাহাকে কিছু বলে না—দোষ দেয় আপন অদৃষ্টের।

সুপ্রভার কথা যে হরিচরণ শুনিত না তাহার আর একটী বিশেষ কারণ ছিল ; হরিচরণের মস্তিষ্কটা কিছু বিকৃত ছিল—সকল সময় সকল কথা সমভাবে লইত না ; একটুতেই রাগিয়া উঠিত। অনেকে বলেন এটী গঞ্জিকাসুন্দরীর প্রেমোন্মত্ততা। যে যাহাই বলুন আমরা তাহা বলিতে পারিব না ; যে হেতু ছেলে পড়াইবার সময় হরিচরণ কখনও নামতা ভুলিত না বা তেমন রাগ করিত না।

হরিচরণ কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়াও জানিত। ছাত্রবর্গের সমক্ষে আপন গুণগরিমাটা সে আপনিই প্রকাশ করিত, তাহার কারণ বোধ হয় সে ভাবিত পাছে তাহার ছাত্রমণ্ডলী তাহাকে একটা অপদার্থ গঞ্জিকাসেবী মনে করে!

"পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরী করা হয়।" সুতরাং সে কখনও পরের দ্রব্যে হস্তক্ষেপ করিত না। তবে কখনও কখনও সুপ্রভার কক্ষ হইতে দুই একটা জামা একটা আধটা ঘটীবাটী সরাইয়া লইয়া খরিদ্দারের সহিত বিনিময় করিত। সে জানিত সুপ্রভা তাহার পর নহে—সুতরাং তাহার জিনিষ না বলিয়া লইলে চুরী করা হয় না। একদিন হরিচরণের কোন একটী ছাত্র তাহার পিতার একটী "রিষ্ট ওয়াচ" আনিয়াছিল কিন্তু ভুলক্রমে তাহা চণ্ডীমণ্ডপে ফেলিয়া যায়—গুরুমহাশয় শুভকর্ম্মে বিলম্ব করা বৃথা বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ দোকানে লইয়া গিয়া নগদ কুড়িটী মুদ্রা আনয়ন করেন—এবং উক্ত বিষয়ে কোনরূপ উচ্যবাচ্য না করিয়া যথারীতি অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এবারেও ওই একই সূত্র—আপন দ্রব্য লইলে চুরী করা হয় না। ছাত্র কি শিক্ষকের পর? গুরু কি শিষ্যের আপন নয়?

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"গিন্নিমা কোথায় দিদিঠাক্রুণ !"

"কেন ?"

"কোন দরকার আছে। একবার তাঁকে ডাক্‌তে পার ?"

"তিনি ওঘরে সন্ধ্যে কর্‌ছেন। কি দরকার বলনা !"

"তোমায় ব'লে কি হবে দিদিঠাক্রুণ ! তাঁকে ডা'ক তিনি এলেই সব শুন্‌তে পাবে।"

সুপ্রভা আর কোন কথা না কহিয়া মাতার নিকট গিয়া কহিল—"মা, তোমায় কে একজন বিধবা এসে ডাক্‌ছেন।"

সুপ্রভার মাতার তখন আহ্নিক শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি উঠিয়া কোশাকুষী খানি যথাস্থানে সংরক্ষিত করিয়া কহিলেন—"কে বিধবা ? তুই তাকে চিনিস্ না ?"

সুপ্রভা কহিল—"গত বুধবার দিন যে এসেছিল।"

সুপ্রভার মাতা কোন কথার উত্তর না দিয়া উক্ত দর্শনপ্রার্থিনী যেখানে বসিয়াছিল সেইখানে আসিয়া কহিলেন—"কি গো মেয়ে ! কি খবর ?"

"তা'রা কাল দেখ্‌তে আস্‌বে।"

সুপ্রভার মাতা কহিলেন—"আমাদের অবস্থার কথা তাঁদের বলে দিয়েছো তো ! আমরা বেশী কিছু দিতে থুতে পার্‌বো না।

তবে, যদি মেয়েটী দেখে তাঁরা দয়া করে নিয়ে যান—আলাদা কথা।”

সুপ্রভা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বুঝিল ইনি একজন ঘটকী। তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী যামিনীর সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছে। সুপ্রভার অনুমানই সত্য।

ঘটকী বলিল—“ওগো মা ঠাকরুণ! তাঁরা এক বনেদী বংশের ছেলে! তারা কি আর অত টাকার কাঙ্গাল? চাঁদের হাটের মিত্তিরদের চেনে না কে?”

সুপ্রভার মাতা—“তা জানি মা তা জানি। তবে কি জান, আমাদের অবস্থা অতি খারাপ। এই দেখনা কেন, একটা মেয়ের বিয়ে দিয়ে বিষের জ্বালায় জ্বল্‌ছি—তা’র কারণ কিছু দিতে পারিনি বলেই তো! তাই বল্‌ছি, এটারও যেন এ দুর্দ্দশা না হয়!”

ঘটকী—“না মা! আমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, তোমার মেয়ের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কোন কষ্ট থাক্‌বে না। জামাইটী যে হবে, যেন সাক্ষাৎ মহাদেব!”

সুপ্রভা হাসিয়া কহিল—“মার বড় জামাইটীও একটী মহাদেব!”

ঘটকী—“তা হবে তা হবে। ওই বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছেন বুঝি?”

সুপ্রভার মাতা—"তুমি কি করে বুঝ্‌লে ?"

ঘট্‌কী—"সেদিন আপনার মুখেই তো সব শুনেছি !"

সুপ্রভা—"যাক্। এখন, মার ছোট মহাদেবটীর বয়স কত হবে ?"

ঘট্‌কী—"তা একটু বয়স হয়েছে বৈকি দিদি ঠাক্‌রুণ ! দোজ্-পক্ষের সংসার তো !"

সুপ্রভা—"তবু কত হবে আন্দাজ ?"

ঘট্‌কী—তা আন্দাজ ন'গণ্ডা আট গণ্ডা হবে। (সুপ্রভার মাতার প্রতি) বয়সের জন্যে কি আসে যায় গা মা ঠাক্‌রুণ ! লোকের বয়স না জল !

সুপ্রভার মাতা কোন কথা কহিলেন না ; কেবলমাত্র কহিলেন—"সেতো ঠিক্ !"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দীনেন্দ্রনাথ যামিনীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিল। তাহাতে সকলে সন্তুষ্ট হইল বটে কিন্তু একজন তাহাতে কোন আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিল না—সে শচীশ। সমস্ত বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করিতে পারা যায়—কেবল একটীতেই পারা যায় না—সেটী স্নেহ। যে আমাদের নিকট স্নেহময়, অপর কেহ তাহার নিকট স্নেহার্থী হইয়া আসিলে আমরা মনে করি উক্ত ব্যক্তির স্নেহ আমাদের প্রতি অনেক পরিমাণে লঘু হইল। বস্তুতঃ হইয়াই থাকে। অবশ্য যিনি মহৎ—মানব নামে অভিহিত হইবার যোগ্য—তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার স্নেহ নির্ব্বিকার—নির্ম্মল—অচ্ছেদ্য—অখণ্ড্য। কিন্তু এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা কত? সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে, এ নিয়ম খাটে না। তাই বুঝি শচীশ মনে করিল তাহার পিতৃস্নেহে একজন অংশীদার আসিয়াছে—আর সে পূর্ব্বের মত পিতার নিকট হইতে সে অনাবিল পূত জাহ্নবী-ধারা-সন্নিভ পিতৃস্নেহ পাইবে না! সুতরাং দীনেন্দ্রনাথের বিবাহের সময় হইতেই শচীশের মনে গুরুভার চাপিয়া রহিল; কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে সে তাহা তিলার্দ্ধও প্রকাশ করিল না। তাহার কারণ সে স্বভাবতঃই কিছু 'চাপা' ছিল। যে কোন কথা তাহার মনে

উদিত হউক না কেন—সে তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জানিতে দিত না।

অতএব সে দুঃখে-সুখে একরূপে দিন কাটাইতে লাগিল। বোধ হয় সে মনকে বুঝাইল—মন তুমি ইহারই মধ্যে এত ব্যস্ত হইতেছ কেন?—যে দিন আমার প্রতি বাবার কোন প্রকার অনাদরের ভাব দেখিবে, সে দিন যাহা ভাবিবার ভাবিও, যাহা করিবার করিও—আজ কেন?—* * * একদিন দীনেন্দ্রনাথ গোপনে যামিনীকে কহিল—"দেখ! আজ থেকে এ সংসার তোমার। একজন সাধ করে খেলাঘর সাজিয়ে ছিল—বিধিবশে তার খেলার সাধ মিট্‌লো না। এখন তার সাজান সংসার তোমার সুখের কারণ ক'রে নাও! তার দুটী স্নেহের পুতলী আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে—তুমি তাদের আপন ছেলে-মেয়ের মতন দেখো! যদি কখনও কোন দোষ করে—মা'র মতন তাদের তিরস্কার ক'রো। আবার কোলে টান্‌বার সময় হলে তাদের কোলে টেনে নিও। দেখো, যেন আমার সব দিক বজায় থাকে।"

যামিনী অধোবদনে সমস্তগুলি শুনিল। কিন্তু, কোন উত্তর করিল না। যামিনী স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতা ছিল; দীনেন্দ্রনাথের কথাগুলি হৃদয়ের নিম্নতম স্তরের হইলেও যামিনী যে সেগুলি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিল এমন বোধ হইল না।

তখন দীনেন্দ্রনাথ কহিল—"দেখ', যামিনি! আমার কথাগুলি রেখো। যদি আমার মতানুযায়ী চল—তবেই তোমায় নিয়ে আমি সুখে ঘর কর্ত্তে পার্‌বো; নতুবা আমার সংসার যে অরণ্য সেই অরণ্যই থাকবে।"

যামিনী কেবল একটী ছোট করিয়া বলিল—"আচ্ছা" কিন্তু মনে মনে কহিল—"নতুবা বিয়ে হ'লে কে কোথায় আবার এমন করে উপদেশ দেয়? আমি কি সংসারের কিছু জানি না?"

দীনেন্দ্রনাথ কহিল—"দেখ, আমার কথাগুলি বোধ হয় তোমার এখন ভাল লাগ্‌বে না; কিন্তু, কি কর্‌বো বল,—আমার এ গুলি তোমার বলা উচিত; কারণ, তুমি কিছু জাননা—ছেলে মানুষ। যাই হোক, কথাগুলি পালন কর্‌বার চেষ্টা ক'রো।"

এ পরিচ্ছেদে যামিনীর রূপগুণের কিছু পরিচয় দিব। অনেকে হয়ত মনে করিবেন যামিনী কতই সুন্দরী—কতই সুরূপা! কিন্তু তাহা নহে। যামিনী কৃশাঙ্গী—শ্যামবর্ণা এবং বিরল-কেশী। বয়স প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে অথচ দেখিলে বোধ হয় পূর্ণযৌবনা। চক্ষু কটাক্ষপূর্ণ—তীব্র এবং কারুণ্যজ্যোতিঃহীন। রূপের বিষয় আর বলিবার তেমন কিছুই নাই—তবে গুণের কথা। সেটী কি করিয়াই বা ঠিক বলিব? এই একমাস অথবা দুইমাস দেখিয়া তাহার এমন কি গুণ জানিতে পারিয়াছি! তবে ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ তাহার অনূঢ়াবস্থায় যে সকল গুণের কথা শুনিয়াছি তাহার

একটু আভাষ দিব। পাড়ার কোন স্ত্রী-সমাজে কোন কলহের সূত্রপাত হইলে যামিনী অগ্রে গিয়া "সভাপত্নীর" আসন গ্রহণ করিত—বাগানে মোড়লদের গরুতে গাছ খাইয়া যাইলে—যামিনী মিষ্ট-মধুর ভাষায় মোড়লনন্দনের পিতাপ্রপিতাদি ক্রমে উর্দ্ধতন পুরুষবর্গের উদ্দেশে নরকোৎসর্গ করিত—পুকুরে কেহ মাছ ধরিলে যামিনী তাহার "দক্ষিণ-দ্বারের" ইচ্ছা প্রকাশ করিত—কৃতান্ত আসিতে অস্বীকার করিলে সে আপনি তাহার আবাহন করিত—ইত্যাদি। সুতরাং যামিনী কিরূপ রূপবতী ও কিরূপ গুণবতী তাহা বোধ হয় সহজেই অনুমান করিতে পারিয়াছেন। অলমতি-বিস্তরেণ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শীতের বেলা, পড়িয়া গিয়াছে; তবে এখনও গাছের মাথায় পাতায় পাতায় একটু আধটু রৌদ্র চিকিমিকি করিতেছে। বাটীর পার্শ্বস্থ মাঠ হইতে রাখাল গরু লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। গ্রামের পথ দিয়া গ্রাম্য বধূগণ কলসীকক্ষে ধুমাবতী হইতে জল আনিতে যাইতেছে। কদাচিৎ, দুই একটা দধিয়াল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে। গোধুলির রক্তিম গগনে দুই একটা ক্ষুদ্র পক্ষী ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া কৃষাণদল হলস্কন্ধে বাটী আসিতেছে। এমন সময় দেখা গেল একটী দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক নদীর ধার দিয়া ধার দিয়া আসিতেছে। তাহার সঙ্গে আর একটী যুবক আছে; তাহারও বয়ঃক্রম পূর্ব্বোক্ত যুবকের মত বা দুই এক বৎসরের কম বেশী হইবে। দ্বিতীয় যুবকটী প্রথম যুবককে কহিল—"ভাই! এইবার বাড়ী চল; আর বেড়িয়ে কাজ নেই। সন্ধ্যেও তো হ'য়ে এল! কাল ভাই বাড়ী যেতে সন্ধ্যে হয়ে গিছ্‌লো বলে দাদা বড় বকে'ছেন।"

প্রথম যুবক বলিল—"আচ্ছা, চল।"

তখন দুই বন্ধু পুনরায় গৃহাভিমুখী হইল। পথে যাইতে

যাইতে দ্বিতীয় যুবক প্রথম যুবককে কহিল—"আচ্ছা, শচীশ! তুমি বাড়ী থেকে বেরুতে চাও না কেন?"

শচীশ বলিল—"আর ভাই! ভাল লাগে না।"

দ্বিতীয় যুবক—"কেন বলত! আগে তো ভাল লাগত!"

শচীশ—"চিরদিনই কি মানুষের সমান যায়?"

দ্বিতীয় যুবক—"সমান কি যায়? সুখে-দুঃখে সমান করে নিতে হয়!"

শচীশ—"তুমি ভুল বুঝেছ, বিমল!"

দ্বিতীয় যুবকের নাম বিমল। শচীশের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ে। পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ আলাপ পরিচয় ছিল না; অথচ উভয়ের বাস এক গ্রামেই। কলেজে শচীশের সঙ্গে বিমলের আলাপ হয়—ক্রমে সেই আলাপ প্রণয়ে পরিণত হইয়া এক্ষণে বন্ধুত্বের আকার ধারণ করিয়াছে।

বিমল শচীশকে কহিল—"যা হোক ভাই, তুমি যেন এখন কি রকম হয়ে গেছ! ভাল করে কথা কও না—যেন দিবারাত্রি কি চিন্তা নিয়ে থাক। কি হয়েছে তোমার?"

শচীশ হাসিয়া কহিল—"কি আবার হবে?"

বিমল—"তবে অমন চুপ্ করে থাক কেন?"

শচীশ—"কই, চুপ করে থাকি? কথা কইনা?"

বিমল—"কথা কইবে না কেন? তোমায় দেখে বোধ হয়,

তোমার কোন রকম অসুখ করেছে, না হয় তোমার মনের ভেতর একটা কোন ঘোর চিন্তা আছে। বল্‌বে না আমায়?"

শচীশ—"কিই বা বল্‌বো ভাই আর কিই বা শুন্‌বে! আসল কথা আমার বাড়ীতে সুখ নেই। বাবা নতুন-মাকে বিয়ে করে পর্য্যন্ত যেন আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। বাড়ীতে যাই, বাবাকে যেমন পর পর বোধ হয়। ছেলেবেলা থেকে মা'হারা—মা কেমন তা চোখে দেখিনি; নতুন-মা বলে ডাকি, তিনি অবগুণ্ঠনবতী হয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যান—এই রকম কত বল্‌বো।"

বিমল—"কেন, তিনি কি তোমায় স্নেহ করেন না?"

শচীশ—"কি করে বুঝবো ভাই! তবে দেখে বোধ হয় আমার প্রতি তাঁর স্নেহ খুবই অল্প বা আদৌ নাই। এই দু'বছর হল বিয়ে হয়েছে—একদিনের জন্যও তাঁকে আমার নিমিত্ত কোন একটা কাজ কর্‌তে দেখিনি। সদাই যেন আমার ওপর তাঁর একটা কি আন্তরিক ঈর্ষা! আমি সব বুঝতে পারি ভাই, কিন্তু কথাটী কইনা, পাছে বাবা কোনপ্রকার অসন্তুষ্ট হন।"

বিমল—"দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করা এই জন্যই অনুচিত। কিন্তু ভাই, আমি একটা কথা বলি—তোমার বাপ অত বড় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়ে আবার একটা বিয়ে কর্‌লেন! সেটা কি জ্ঞানী লোকের কাজ হ'ল?"

শচীশ—"ভাই, বাবাকে তুমি জাননা তাই তুমি বাবাকে দোষ দিচ্ছ! বাবা আমার সাক্ষাৎ দেবতা! বাবা কি নিজে ইচ্ছে করে বিয়ে করেছেন? যত নষ্টের গোড়া আমার ওই পিসিমা। তাও আপনার নয়—সম্পর্কীয় নয়—নাম মাত্র। তাঁর জন্যই তাই আমার অমন বাপ্ পর হয়ে যেতে বসেছেন!"

বিমল—"তোমার বাপ্ তোমায় কোন অযত্ন করেন কি?"

শচীশ—"না। তা' এখনও ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

বিমল—"তবে চুপ্ করে থাক। কেবল দেখে যাও।"

শচীশ—"তাইত বল্‌ছি, বাবার কোন অযত্ন দেখলে তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা কর্‌বো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একদিন সন্ধ্যাবেলা পড়িবার সময় শচীশ যামিনীকে আসিয়া কহিল—"নতুন-মা! তোমার ঘরের আলোটা একবার দেবে? কাল টেবিলের উপর থেকে বিড়ালটা আলোটা ফেলে দিয়ে তার চিম্‌নীটা ভেঙ্গে দিয়েছে।"

যামিনী কিঞ্চিৎ ঘৃণার সহিত কহিল—"অত অসাবধানী থাক কেন? বেশ হয়েছে। অন্ধকারে পড়।" এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে শচীশ কহিল "আচ্ছা, আজকের মতন একবার দাও—কাল আর চাইব না।"

যামিনী গম্ভীরভাবে বলিল—"আপনি নিতে তো পার! আমি তো আর আলোটা বাক্সয় চাবি দিয়ে রাখিনি! তবে, আর আমায় মিছামিছি জিজ্ঞাসা করা কেন? হাত, পা আছে—দরকার হয় নিজে গিয়ে নিয়ে এস।"

শচীশ মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। যাহা হউক, সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া আলোটা আনিয়া পড়িতে বসিল।

একটু পরে দীনেন্দ্রনাথ কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল—"কই গো! ঘরে আলো কই?"

কথাটা যামিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া হইয়াছিল। সে তখন রান্না-ঘরে দুধ জ্বাল দিতে ছিল; দীনেন্দ্রনাথের কথাটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে কহিল—"তা' কি কর্‌বো? আমি তো আলো তৈরী কর্‌বো না!"

দীনেন্দ্র—"কেন গো, হ'ল কি?"

যামিনী—"তা' নয় ত কি? মোটে নসীরামের সম্ভাবনা ওই একটা আলো—তাই যদি তোমার আদুরে ছেলে পঞ্চাশবার নিয়ে টানাটানি কর্‌বে তা' আর আমি তোমায় কোত্থেকে আলো দোব বল! সে দিন দিইনি বলে—আপিস্ থেকে এসে আমার ওপর কি ঝাঁজ!"

দীনেন্দ্র—"ঝাঁজ আর কি দেখিয়েছি? তুমি বাপু বড্ড বল!"

যামিনী—উচিত কথা বল্‌তে গেলে বন্ধু বিকৃড়ে যায় এ তো চারকেলে কথা! তুমি আর বল্‌বে এ আর বেশী কথা কি?"

দীনেন্দ্রনাথ আর কোন কথা না কহিয়া আপনার গাত্রের বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া যথাস্থানে রাখিল এবং পরে কহিল—"তবে একটী প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যাওনা!"

যামিনী উঠিয়া আসিয়া একটী প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

দীনেন্দ্রনাথ মুখে হাতে জল দিতে দিতে কহিল—"শচীর আলো কি হ'ল?"

যামিনী—"ভেঙ্গে গেছে।"

দীনেন্দ্রনাথ—"কি করে ভাঙ্‌লো ?"

যামিনী—"বেরালে ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে।"

এইরূপ দুই একটা কথা কহিতে কহিতে দীনেন্দ্রনাথের নাসিকায় একটা দগ্ধগন্ধ প্রবেশ করিল; সে তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল—"ওগো, দেখ না, কিসের ধরা-গন্ধ বেরুচ্ছে!"

যামিনী উনানে দুধ চাপাইয়া আসিয়াছিল—সুতরাং সে কিসের ধরাগন্ধ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিল—কিন্তু বাহ্যতঃ কোন সত্বরতা প্রকাশ না করিয়া অতি ধীরভাবে কহিল "কিসের আবার ধরা-গন্ধ ?"

দীনেন্দ্রনাথ আর কোন কথা কহিল না। ওদিকে সমস্ত দুধটুকু যাহা দীনেন্দ্রনাথের জীবন বলিলেও হয়—সেটুকু সমস্ত পুড়িয়া ক্ষার হইয়া যাইল। দীনেন্দ্রনাথের সেদিন আর দুগ্ধ পান করা হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এইরূপ সুখ-দুঃখের মধ্যে থাকিয়া শচীশ আই-এস্-সি পরীক্ষা দিল এবং বৃত্তি পাইল। শুনিয়া দীনেন্দ্রনাথ তাহাতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহা ততদূর প্রকাশ করিতে পারিল না। কারণ, বোধ হয় যামিনীর ভয়ে। যেহেতু দীনেন্দ্রনাথ জানিত যে যামিনী সুষমা নয়—কখনও হইবে না অথবা কখনও হইতে পারে না। সুষমার কাছে আনন্দ প্রকাশ করিলে সে আজ তাহার উপযুক্ত প্রতিদান পাইত কিন্তু যামিনীর নিকট প্রকাশ করিলে তাহার কোনই ফল হইবে না। বরঞ্চ যামিনী তাহার আনন্দবিজড়িত কথাগুলি অনাদৃতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিবে।

যাহা হউক, দীনেন্দ্রনাথের অবস্থা যদিও তেমন ভাল নহে, তথাচ কে আপন পুত্রকে উচ্চশিক্ষিত না করিতে ইচ্ছা করে? সুতরাং সে শচীশকে উচ্চতর শ্রেণীতে নিয়োজিত করিয়া দিল।

শচীশ বি-এস্-সি পড়িতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু আর একটী কথা; শচীশ পাশ করিল তাহাতে সকলেই বিশেষ আহ্লাদিত হইল; কিন্তু যামিনীর মনে শান্তি আসিল না কেন?

যামিনী ভাবিল—শচীশ শুধু পাশ করিয়াছে এমন নহে,

প্রকারান্তরে তাহাকে শিক্ষা দিতেছে যে তাহার ভ্রাতা শচীশের তুলনায় একটা গণ্ডমূর্খ। শচীশ এত ছোট তবু ইহারই মধ্যে এত শিক্ষিত হইল ; আর তাহার ভ্রাতা শচীশের অপেক্ষা কত বড়, তবু লেখাপড়া শিখিতে পারিল না !

যে যাহাকে দেখিতে পারে না সে ভাল কাজ করিলেও মন্দের কারণ হইয়া থাকে ! একদিন শচীশ যামিনীকে বলিল—"নতুন-মা ! আমার পাশে সবাই আনন্দ কর্‌লে আর তুমি যে কোন কথা কইলে না ! আজ যদি আমার মা বেঁচে থাক্‌তেন, তিনি কখনই এমন করে থাক্‌তে পার্‌তেন না !"

শুনিয়া যামিনী ক্রোধে আগুণ হইয়া গেল। অথচ একটা উত্তর না দিলেও চলে না ; সুতরাং সে মনের ভাব মনে রাখিয়া অতি উদাসীনভাবে কহিল—"পড়েছ, পাশ করেছ। এর আর বেশী কথা কি ? তা'বলে কি তাই নিয়ে পাড়া মাথায় কর্‌তে হবে নাকি ?"

শচীশ যামিনীর মনের ভাব বুঝিল। শুধু যে এখন বুঝিল এমন নহে ; বুঝিয়াছে অনেক দিন। তবে, আরো ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য কহিল—"তাহোক, তবু একটা আনন্দ করে তো !"

যামিনী কিঞ্চিৎ নীরব রহিল। বোধ হয় উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। যাহা হউক, কিঞ্চিৎকাল পরে কহিল—"আনন্দ কর্‌বার জন্যে অনুরোধ না কর্‌লে বোধ হয় আনন্দ করতুম !"

শচীশ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল ; সুতরাং সে উত্তরে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা বিক্ষোভিত হইল না ; অন্য কেহ হইলে বোধ হয় তদ্দণ্ডেই স্তম্ভিত হইয়া যাইত অথবা তাহার যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিত। শচীশ কিন্তু সে সব কিছুই না করিয়া আপনার কাজে চলিয়া গেল।

যামিনী শচীশের প্রস্থানে মনে করিল—এ পরীক্ষোত্তীর্ণের মদগর্ব্বিত পদক্ষেপ মাত্র।

বাস্তবিক না হইলেও—যামিনীর মনে একটা ভার চাপিয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দীনেন্দ্রনাথের বিবাহের পর হইতেই শেফালীর মন যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। সে পূর্ব্বে যেমন পত্রাদি লিখিত এখন আর তেমন লেখে না ; তখন পিত্রালয়ে আসিবার জন্য দীনেন্দ্রনাথকে কত অনুরোধ করিত এখন আর সে সব কিছুই করে না। সে দিন দীনেন্দ্রনাথ শেফালীকে লইতে গিয়াছিল, সে আইসে নাই। বলিয়াছে—"বাবা! এখন তো আমার মা নেই! আমার আর কিসের বাপের বাড়ী? এ সংসারে যার মা নেই—তার শত শত আত্মীয় স্বজন থাক্‌লেও কেউ নেই!"

দীনেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল—"দূর পাগ্‌লী! ও কথা কি বল্‌তে আছে? যতদিন আমি আছি ততদিন জানিস্ তোর সকল দিক বজায় আছে! যেদিন আমি ম'রে যাব, সেদিন তোর বাপের বাড়ীর সঙ্গে বরঞ্চ কোন সম্বন্ধ না থাক্‌লেও না থাক্‌তে পারে। বল্—কবে যাবি।"

শেফালী কোন মতেই আসিতে স্বীকৃত হইল না; অবশেষে দীনেন্দ্রনাথকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

শেফালীর না আসিবার কারণ ছিল। শচীশ মর্ম্মাহত হইয়া তাহার 'নতুন-মার' ব্যবহার শেফালীকে প্রায়ই লিখিত। শেফালী

যত বড়ই হউক না কেন কি করিবে? সে তাহাকে তাহার নিকট আসিয়া থাকিতে বলিত; কিন্তু শচীশ পিতার বিনা অনুমতিতে কুটুম্বগৃহে আসিয়া বাস করা তেমন উপযুক্ত বিবেচনা করিত না। কাজে কাজেই শেফালী তাহাতে একটু রাগও করিত।

কয়েক মাস হইল শেফালী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। তদুপলক্ষে আজ তাহার অন্নপ্রাশন। সুতরাং নিমন্ত্রিত হইয়া শচীশকে শেফালীর বাটিতে আসিতে হইল। কিন্তু, দীনেন্দ্রনাথ একবার শেফালীকে লইতে আসিয়া বিমুখ হইয়া গিয়াছে এই অভিমানে সে আর পৌত্রের বদন দর্শন করিতে আসিল না। তবে, মাতুল না হইলে নাকি শিশুর মুখে প্রথমান্ন দানের প্রথা নাই—তাই দীনেন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া শচীশকে পাঠাইয়া দিয়াছে এবং অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যাহা কিছু দেয় তাহাও যে দীনেন্দ্রনাথ দেয় নাই এমন নহে। আর এরূপ দেওয়া তাহার আন্তরিক অথবা লোকলজ্জাভয়ে সে কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে এইটুকু বলিব যে, শেফালীর বাপের বাড়ী না যাওয়াতে দীনেন্দ্র নাথের হৃদয়ে যত ব্যথা লাগুক্—সেটা নানাপ্রকার কথা-বিন্যাসে দ্বিগুণিত করিয়া দিয়াছে—যামিনী। কারণ, শেফালীর পুত্রের এই অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কি কি দ্রব্য-সামগ্রী পাঠাইতে হইবে দীনেন্দ্রনাথ সন্ধ্যাবেলা তাহার বিছানায় বসিয়া যখন একটা তালিকা নির্দ্ধারণ করিতেছিল—তখন যামিনী নিকটে আসিয়া—

"এত বড় ফর্দ্দ কচ্ছ—কত টাকা লাগ্‌বে জান ?—তুমি ছাপোষা মানুষ অত বড় লোকের সঙ্গে পাল্‌লা দিতে গেলে মারা-পড়্‌বে যে !" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহার মত প্রদর্শন ও স্বামীভক্তি ব্যক্ত করিতেছিল।

যাহা হউক, অনেক দিনের পর শচীশকে পাইয়া যেন শেফালীর স্নেহ গোমুখীর ন্যায় শতধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল —হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন একসঙ্গে একই সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল ! সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া শচীশের হাত ধরিয়া টানিয়া উপরে লইয়া গেল। ঠিক্ এম্‌নি সময় দালানের কোনে— যেখানে জলের জালা, মাটীর গেলাস, কুশাসন প্রভৃতি স্তূপীকৃত আছে—সেইখানে একজন লোক সিক্ত বস্ত্রখণ্ডদ্বারা কদলীপত্রগুলি প্রক্ষালিত করিতেছিল। সে পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য দেখিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। অবিলম্বে কহিয়া উঠিল—"নূতন অতিথির এত আদর ? পুরানো হ'লে বুঝি আর তাদের প্রতি নজর থাকে না ?—"

বক্তা স্বয়ং সুনীতিকুমার। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের ভোজনার্থে পত্রাদি পরিষ্কার করিতেছিল।

শেফালী তাহার কথায় একটী সপ্রেম কটাক্ষ করিয়া একটু হাসিল এবং ভ্রাতাকে লইয়া আপনার ঘরের বিছানায় গিয়া বসাইয়া দিল।

শচীশও বসিয়া কহিল—"দিদি ! তুমি পাগল না কি !"

শেফালী সহাস্যবদনে বলিল—"কেনরে !"

শচীশ—"যে ক'রে আমায় টেনে আন্‌লে ! আমার হাত্‌টা কন্‌ কন্‌ কর্‌ছে।" "কই, দেখি—সত্যি ?" বলিয়া শেফালী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া শচীশের হাতখানি ক্রোড়ে টানিয়া লইল।

শচীশই ঠকিয়া গেল। সে বলিল—"না না ও মিছে কথা ! ছেলেবেলায় কি মার দুধ খাইনি ?"

সহসা মাতার কথা শুনিয়া শেফালী গম্ভীরভাবে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া বসিল। যেন সমস্ত শরীর দিয়া তাহার একটা বিদ্যুতের প্রবাহ বহিয়া গেল !

পরে কহিল—"যাক্। কেমন আছিস ? কেন চিঠিপত্র লিখিস্ না বল্‌তো !"

শচীশ—"কেন লিখ্‌বো না ! লিখি তো ! তুমিই বরং তার উত্তর দাও না।"

শেফালী—"লিখ্‌বি না কেন ? যা লিখিস্ তাই তোর দুঃখের কাহিনীতে ভরা ! তা'র কিই বা পড়্‌বো আর কিই বা উত্তর দিব !"

শচীশ—"দিদি ! আমার সারা জীবনটা যে দুঃখময় ! মনে করি আমি কষ্ট পাচ্ছি একা কষ্ট পাই ; তোমায় আর জড়াব না। কিন্তু তা পারি না। যখনই কালী-কলম নিয়ে বসি—

তখনই যেন আমার একটা কেমন ইচ্ছে হয় যে আমি কেমন অবস্থায় আছি তোমায় জানাই। জানিয়ে যদি একটু কষ্টের লাঘব হয়!"

শেফালী যেন কথাগুলি গিলিতে লাগিল। কহিল—"আমি তো কতবার বলেছি,—তোর ওখানে থেকে কাজ নেই। বাবা যখন বিয়ে করেছেন তখন তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকলেও নতুন-মা তা' রাখ্‌তে দেবে না; তুই এখানে চলে আয়। কুটুম্ব-বাড়ী বলে আস্‌তে চাইচিস্ না? আমি তো আর তোর কুটুম্ব নই! আমি বল্‌চি এখানে এসে থাক্!"

এমন সময় স্থনীতিকুমার কি কাজের জন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল—"শুধু কথায় তো আর পেট ভর্‌বে না! এখন, কুটুম্ব এসেছে—জল টল খাওয়াও—খাতির কর। কথা পরে হবে অখন।"

শেফালী দেখিল তাহার কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। স্থতরাং সে শচীশের জন্য জল খাবারের বন্দোবস্ত করিতে নিচেয় চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দীনেন্দ্রনাথ কাছারী হইতে আসিয়া দেখিল—ঘরের ভিতর যামিনী অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। দেখিল তাহার জন্য পা ধুইবার জল, জলখাবার প্রভৃতি কিছুই সাজান নাই ; ঘরে একটী মৃণ্ময় প্রদীপ ক্ষীণ কিরণজাল বিস্তার করিয়া সর্ব্বাংশের অন্ধকার দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—"কিগো ! কি হয়েছে ?"

যামিনী উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে কহিল—"মাগো ! তুমি কোথা গেলেগো বাবা মরে গিয়েছিলেন—তুমি যে আমাদের সে শোক জান্‌তে দাওনি গো !"

বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিল।

তখন দীনেন্দ্রনাথের প্রকৃত ব্যাপারটা আর বুঝিতে বাকি রহিল না ! সে শুনিয়া ছিল যে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ভয়ানক মরণাপন্ন অসুখ। কারণ, দিন কয়েক পূর্ব্বে যামিনীর ভ্রাতা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া ছিল। কিন্তু দীনেন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গে যামিনীকে পাঠায় নাই। বলিয়াছিল—"এখন কোন যাবার দরকার নেই ; পরে দরকার হয় পাঠিয়ে দিব। এখন গিয়ে ওই বা কি কর্‌বে ?"

যাহা হউক দীনেন্দ্রনাথ কহিল—"তা' তুমি অত কাঁদ্‌ছো কেন? বাপ মা কি কখনও কারো চিরকাল থাকে? এই দেখনা কেন—শচীশশেফালী। তারা কত ছোট বয়সে মা'হারা হয়েছে বল দেখি!"

যামিনীর মার সহিত শচীশের মার তুলনা? কিসে আর কিসে!

সে বিরক্তস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"ওগো! যার যায় সেই জানে। তুমি তো আমায় একবার শেষ দেখা দেখ্‌তে দিলে না! মাগো! তুমি যে পথে গেছ, আমাকেও সাথী করে নাও গো। আর জ্বালা সহ্য কর্‌তে পারিনা গো।——"

দীনেন্দ্রনাথ দেখিল এ উপায়ে হইবে না। তখন সে কাপড় জামা ছাড়িয়া—পা হাত মুখ ধুইয়া বিছানায় বসিল এবং সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যে কহিল—"কি কর্‌বে বল, ভগবান্ যা' করেন তা'র ওপর তো আর মানুষের হাত নেই! সংসারে আশ্চর্য্যের বিষয় মৃত্যু নয়; আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ল জন্ম! যে জন্মাবে সেই মর্‌বে। তার জন্যে তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?"

তুমি আজ কাঁদ্‌ছো—আবার দুদিন পরে, না হয় দশ বছর পরে আবার তোমার জন্যে কাঁদ্‌বে। কেঁদে কি হবে, কেঁদে কি তাঁকে পাবে? তিনি এখন অক্ষয়স্বর্গে—তুমি এখন মায়ার সংসারে। যে একবার মায়ার শক্ত বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেছে,

সে কি আর সহজে ধরা দিতে চায়? তোমার কান্নায় তো তিনি ফিরে আস্‌বেন না! ওঠ—কেঁদো না।"

এইরূপে দীনেন্দ্রনাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। যামিনীর মাতার স্বর্গে বাসস্থান নির্ম্মাণ হইয়াছে কিনা অথবা তিনি এক্ষণে মন্দাকিনীতে স্নান—নন্দন-কাননে ভ্রমণ করিতেছেন কিনা সে বিষয় আমরা সম্যক্ অবগত নহি। তাহা না হইলেও যামিনী মাতার স্বর্গপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্রন্দনের মাত্রা কমাইয়া দিল।

দীনেন্দ্রনাথ দেখিল ওদিকে উদরে বুভুক্ষার সঞ্চার হইয়াছে। সে আর কোন কথা না কহিয়া আপনিই আহারাদির ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইল। কারণ মাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অবধি যামিনী শয্যা লইয়াছে, আহারাদি প্রস্তুত হয় নাই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল; তাহার বিস্তারিত বিবরণের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে এই কয়েক দিনের মধ্যে যে কয়টা অত্যাবশ্যকীয় এবং উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে তাহারই কিছু আভাষ দিব।

মধ্যে চারুবাবুর রক্ত-আমাশয় করিয়া ভয়ানক জ্বর হয়। প্রথমে তিনি অথবা অন্য কেহ জ্বরকে তত গ্রাহ্য করিলেন না; কিন্তু পরে সেই জ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিসম আকার ধারণ করিল এবং চারু বাবুকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। গ্রামে ভাল চিকিৎসক বা বৈদ্য নাই, সুতরাং ভিন্ন গ্রাম হইতে একজন সুদক্ষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার আনাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার চিকিৎসার ভার দেওয়া হইল। অজস্র অর্থব্যয় করা হইল, কিন্তু কোনই ফললাভ হইল না। বরঞ্চ রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই লাগিল। উক্ত চিকিৎসকের দ্বারা কোন বিশেষ ফল হইতেছে না দেখিয়া অপর একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আনান হইল। তিনিও আরোগ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে পূর্ণিমার অষ্টমী তিথিতে তিনি আত্মীয়-স্বজন সকলকে কাঁদাইয়া মরণ-পথের পথিক হইলেন।

চারু বাবুর মৃত্যুতে সকলেই বিশেষ মর্ম্মাহত হইল; তন্মধ্যে বেশী মর্ম্মাহত হইল—শেফালী। কারণ সে যত চারু বাবুর নিকটে থাকিত, সে যত তাঁহার রোগের সময় শিয়রে বসিয়া যত্নের সহিত ঔষধ পথ্যাদি সেবন করাইত, অন্য কেহ এমন কি ভোলানাথ পর্য্যন্তও বোধ হয় এতদূর করিত না। সকাল বেলা হইলেই তাহার মনে হইত এই তাহার ঔষধ খাওয়াইবার সময়—এই সময় ডাক্তার আসিত। চারু বাবু যে কক্ষে শয়ন করিতেন শেফালী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিত বিছানা শূন্য পড়িয়া আছে—যেন শয্যা তাঁহারই স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে! শেফালী কখনও জানালায় বসিয়া কাঁদিত—কখনও শশুরের উদ্দেশে শূন্যপথে চাহিয়া থাকিত—যদি তাঁহাকে একটীবার দেখিতে পায়! জোৎস্না রাত্রিতে শেফালী কোন কোন দিন ছাদে উঠিত—দেখিত অসংখ্য তারকারাজি নীলাকাশের গায়ে মণিমাণিক্যখচিত শুভ্র বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। শেফালী জানিত মানুষ মরিয়া স্বর্গে যায়; কিন্তু স্বর্গ কোথা? স্বর্গ দেখিতে কিরূপ? লোকে বলে স্বর্গ উপরে—কারণ, স্বর্গের বিষয় কোন কথা উঠিলেই মানুষ উর্দ্ধদেশে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে। তবে কি স্বর্গ আকাশের কোলে? তাই যদি হয় তবে তো মানুষ মরিয়া স্বর্গে অথবা নক্ষত্রলোকে যায়! যদি মানব মরিয়াই নক্ষত্রলোকে যায়—তবে তো বাবাও সেইখানে গিয়া-

ছেন! তিনি হয়ত আমাদের দেখিতে পাইতেছেন! আমি যে এই ছাদের উপর বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছি . তিনি হয়ত সব দেখিতে পাইতেছেন; কিন্তু স্বভাবের . নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া নামিয়া আসিতে পারিতেছেন না! কিন্তু হায়! যদি চিনিবার উপায় মানবের থাকিত! চিনিব কিরূপে? কত শত শত তারকা রহিয়াছে উহার মধ্যে কোন্‌টী বাবা? ওই যে নারিকেল গাছের মাথার উপর দুইটা বড় বড় তারা জ্বলিতেছে, উহারাই কি 'বাবা' এবং পূর্ব্বমৃতা 'মা'? কি করিয়া চিনিব? বিজ্ঞানের বলে লোকে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু প্রস্তুত করিতেছে বিজ্ঞানের বলে কথা কহাইতেছে কিন্তু এমন কোন উপায় কি বাহির করিতে পারে নাই যাহার দ্বারা ওই নক্ষত্রলোকস্থিত মৃত ব্যক্তিবর্গকে দেখিতে পাওয়া যায়? শুনিয়াছি দূরবীণের সাহায্যে অনেক দূর দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে কি ওই স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না?

এইরূপ কত অমূলক ধারণা শেফালীর মনে উদিত হইত; কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কোন কুল কিনারা পাইত না। অবশেষে সে একদিন ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা! তোমরা ত অনেক বই পড়েছ; বল্‌তে পার মানুষ মরে কেন, আর যদিই মরে তবে আবার ফিরে আসে না কেন?

ভোলানাথ একজন বঙ্গীয় কবির পুস্তকে ঠিক এই বিষয়ই পাঠ

করিয়াছিল। সে কহিল—"পণ্ডিত লোকেরা বলেন, মানুষ মরে না। মানুষ অর্থে আমরা সাধারণতঃ রক্তমাংসের শরীরটাই বুঝি। কিন্তু এখানে মানুষ অর্থে তার সূক্ষ্ম আত্মা। আত্মা অবিনাশী—দেহান্তর পরিগ্রহ করে মাত্র। এই দেহান্তর পরিগ্রহকেই আমরা মৃত্যু বলি। লোকে যেমন ছেঁড়া বা ময়লা কাপড় ত্যাগ করে নতুন কাপড় পরে; সেই রকম জীবাত্মা এক জীব দেহ পরিত্যাগ করে অন্য জীবদেহে প্রবেশ করে। আত্মা কোথাও যায় না; আবার ফিরে আসে। তবে সেটা বিভিন্ন মূর্ত্তিতে! আমরা অদূরদর্শী মানব তা বুঝ্‌তে পারি না; কিন্তু যাঁরা জীবন-মৃত্যু-তত্ত্ব-বিৎ তাঁহারা পূর্ব্বে এই সূক্ষ্ম আত্মা যে দেহে অবস্থান করিতেছিল, এখন যে দেহ ধরিয়াছে তার সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য দেখ্‌তে পান।"

শেফালী কহিল—"এমন পরিবর্ত্তন হয় কেন? এক দেহেই বা আত্মা বেশী দিন থাকে না কেন?"

ভোলানাথ—"এর কারণ মানুষে বল্‌তে পারে না। তবে, লোকের পরমায়ুঃ যে নিজের কর্ম্মফলের ওপর নির্ভর করে!"

শেফালী আর কোন কথা না কহিয়া অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যতে কি হইবে—বর্ত্তমানে নিবিষ্ট মনে ভাবিলে আমরা অনেক সময়ে তাহার কতকটা আভাষ পাই। কারণ, মনের সহিত ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের অনেক সামঞ্জস্য আছে। এই জন্যই মনকে সর্ব্বজ্ঞ বলে। এ মত শুধু যে আমাদের ভিতর আছে এমন নহে, বিলাতেও ইহা লইয়া কত আন্দোলন চলিতেছে। মেস্‌মেরিজম্, হিপ্নটিজম্ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের সহিত এই মনের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট। আর মেস্‌মেরিজম্ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপে একটী বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয়—সেটীকে ইংরাজরা "চিন্তার চরম সীমা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই "চিন্তার চরম সীমার" উৎপত্তিস্থল—মন। তাই বলিতেছি, মন সর্ব্বজ্ঞ এবং ভবিষ্যদ্বক্তা।

শচীশ ভাবিয়াছিল—বাবা যখন দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন তখন আমার উপর কখনই তাঁর সমভাবে স্নেহ থাকিবে না। ফলেও তাহাই হইয়াছে। যামিনী দীনেন্দ্রনাথকে শচীশের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগে দিবারাত্র উত্ত্যক্ত করিত—কোন একটু সামান্য দোষ পাইলে তাহা দ্বিগুণিত করিয়া দীনেন্দ্রনাথের কর্ণে তুলিয়া দিত।

মানুষের মন ; সহজেই দুর্ব্বল। দীনেন্দ্রনাথ, অনেক সময়ে তাহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিত না, এবং দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া শচীশকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও ভৎর্সনাও করিত। শচীশ কি করিবে ? সে তাহা যতদূর সম্ভব সহ্য করিত ; কিন্তু অবশেষ যখন প্রায়ই সে পিতার নিকট হইতে এরূপ ভৎর্সিত ও বিকৃত হইতে লাগিল তখন তাহার আর সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকিল না ; অথচ যে পিতার মুখের উপর কোনও উত্তর দিত তাহাও নহে। অবশেষে তাহার মনে আপনা হইতে একটা আত্ম-গ্লানি এবং ধিক্কার আসিয়া উপস্থিত হইল ; মনে করিল এ প্রাণ আর রাখিব না—ধুমাবতীতে তো অনেক জল আছে ! সেই জলে এই মনঃকষ্ট নিবারণ করিব। এ দুঃখের কথা আর কাহাকেও জানা-ইব না—এ দুঃখের কাহিনী লইয়া আর 'দিদিকে' কষ্ট দিব না। কিন্তু—আত্মহত্যা ? 'আত্মহত্যা যে মহাপাপ ! তবে উপায় ?—মৃত্যুই উপায়। নতুবা এ জীবন লইয়া কি করিব ? এতদিন যে আশায় যে ভরসায় জীবন রাখিয়াছিলাম—আজ সে আশা ভরসা কই, এতদিন মনে করিতাম নতুন-মা পায়ে ঠেলিলেও বাবা আমায় পায়ে ঠেলিতে পারিবেন না। আজ দেখিতেছি—সব তাহার বিপরীত ! কলেজে পড়িতেছিলাম—বাবার চাকুরী নাই বলিয়া আমায় কলেজ ছাড়াইয়া লইয়াছেন। যে বাবা আমায় অত স্নেহ করিতেন—আজ আমার সেই বাবার এত পরিবর্ত্তন !

প্রায় এক মাস গত হইল দীনেন্দ্রনাথের চাকুরী নাই ; সুতরাং শচীশের লেখাপড়া একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, সেটী যামিনীর প্ররোচনায়।—

গঙ্গাধর ঘোষের বাটীতে বৎসর বৎসর শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণ জীউর রাস-যাত্রার উৎসব হয়, এবং সেই উপলক্ষে নানা দেশ বিদেশ হইতে নানাবিধ এবং বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। বাহিরে দোকান-পত্র গান বাজনা যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি হয় ; উৎসবের কয়েকদিন ধরিয়া সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীগোপালজীউকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। এত ভিড় হয় যে বলিবার নহে ; এমন কি গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে তখন পুলিশ-কনেষ্টবলের ব্যবস্থা করিতে হয়। দিবারাত্র সেখানে লোক চলাচলি করে। আজ সেই উৎসব।

শচীশ রাস দেখিতে গেল। তাহার সহিত আর একটি যুবক ছিল—যুবক আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বিমল! পথে যাইতে যাইতে বিমল শচীশকে কহিল—"দেখ ভাই শচীশ! আজ একটু যাত্রা শুনে আস্‌তে হবে! শুন্‌চি কল্‌কেতা থেকে ভাল যাত্রার-দল এসেছে।"

শচীশ—"না বিমল! দরকার নেই! রাত্তির হয়ে যাবে। একেই তো দেখ্‌তে পাচ্ছ বাড়ীতে কেমন সুখে আছি! তার ওপর আবার যাত্রা শুনে রাত্তিরে বাড়ী গেলে কি আর রক্ষে আছে? তার চেয়ে চল ভাই শ্রীকৃষ্ণজীর পাদ পদ্ম দর্শন করে বাড়ী ফিরি।"

বিমল কি উত্তর দিতে যাইতেছিল এমন সময় দেখিল—পথের ধারে একটি বালিকা নাত্যুচ্চস্বরে রোদন করিতেছে। বিমল শচীশকে দেখাইয়া কহিল—"বল দেখি শচীশ! ও মেয়েটী কাঁদ্‌ছে কেন?"

শচীশ কহিল—"কি জানি?"

বিমল নিজেই কহিল—"আমার বোধ হয় ও যার সঙ্গে রাস দেখ্‌তে এসেছিল তাকে হারিয়ে ফেলেছে—তাই তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে কাঁদ্‌ছে। যাই হোক, চল একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি না কেন!"

শচীশ কহিল—"যদি কাঁদবার অন্য কোন কারণ থাকে!"

বিমল—"চল না একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌তে দোষ কি?"

শচীশ দেখিল, বালিকার মুখখানি চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। নয়ন দুইটিতে যেন একটি উদাস করুণ ভাব মাখান রহিয়াছে—সে যেন বাস্তবিকই তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে!

শচীশ ও বিমলকে যাইয়া আর কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হইল না—তাহাদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া বালিকা অবনতবদনে আপনিই কহিল—"আপনারা একটু দাঁড়ান্ না আমি বড় বিপদে পড়েছি।"

শচীশ বিশেষ সহানুভূতি সহকারে কহিল—"তোমাকে দেখেই আমরা তা' অনেকটা অনুভব করেছি; তাই জান্‌বার

জন্যই আমরা এসেছি। বল কি বিপদ; আমরা যতদূর পারি তোমার উপকার করতে ক্রটী করবো না।"

বালিকা তখন পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা মৃত্তিকা খুঁড়িতে খুঁড়িতে কহিল—"আমি আমার দিদিমার সঙ্গে রাস দেখ্‌তে এসে-ছিলুম—হঠাৎ এই ভিড়ের মধ্যে তিনি হারিয়ে গেছেন আমি খুঁজে পাচ্ছিনা।"

শচীশ—"কখন হারিয়ে গেছেন?"

বালিকা—"দুপুরবেলা।"

শচীশ—"আর, এখন এই সন্ধ্যে হয় হয়। এতক্ষণেও তুমি তাঁর দেখা পাওনি?"

বালিকা কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল—"না।"

শচীশ—"তার জন্যে আর দুঃখু কি? তোমার বাড়ী কোথায়?"

বালিকা—"মিছিলপুর।"

শচীশ—"তোমার পিতার নাম।"

বালিকা—নরেন্দ্রনাথ দে।

বিমল এতক্ষণ দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। সে শচীশকে কহিল—"এখন কি করবে?"

শচীশ নিরুদ্বিগ্নভাবে কহিল—"করবো আর কি? এর বাড়ীতে রেখে আসবো!"

অমনি বিমল একটু হাসিয়া শচীশের দিকে একটা কটাক্ষ করিল। সে অর্থপূর্ণ চাহনিটা শচীশের বুঝিতে যে বাকী থাকিল না সে কথা বলাই বাহুল্য।

বিমলকে হাসিতে দেখিয়া বালিকা যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল—সে নতমস্তক আর একটু নত করিয়া দিল।

তখন, যেন সে কোন কিছুই করে নাই এরূপ ভাবে বিমল কহিল—"তা'তে যে রাত্তির হবে! তোমার বাড়ীতে তা'হেলে আর রক্ষে থাকৃবে না কিন্তু?"

শচীশ কহিল—"না থাকে—নাচার। তুমি বাড়ীতে গিয়ে না হয় সমস্ত ব্যাপারটা ব'লো। তা' বলে তো আর এই ছেলে-মানুষ অনাথা বালিকাকে পথের ধারে একলা ফেলে যেতে পারি না! এক না দেখ্‌তুম—আলাদা কথা।"

শচীশের কথানুযায়ী বিমল বাড়ী ফিরিয়া গেল। শচীশও অবি-লম্বে একখানি পাল্কী ডাকিয়া বালিকাকে তাহার ভিতর তুলিয়া লইয়া আপনি পদব্রজে মিছিলপুর অভিমুখে রহনা হইল। মিছিলপুর চাঁদের হাট হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পথ হইবে। যাহা হউক, সে বালিকাকে স্বগৃহে পৌঁছাইয়া দিল। পরোপকার হৃদয়ে জাগরূক হইলে বোধ হয় কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। নইলে, সেই রাত্রির অন্ধকারে শচীশ ততখানি পথ হাটিয়া যাইল কি করিয়া? নরেন্দ্র বাবুও শচীশকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন।

এ দিকে বিমল আসিয়া শচীশের বাটীতে সংবাদ দিল। অন্তরাল হইলে যামিনী উক্ত ঘটনা শুনিল। সন্ধ্যার পর দীনেন্দ্র নাথ বাটীতে আসিয়া যখন শচীশের খোঁজ করিল তখন যামিনী কহিল—"তোমার ছেলে তৈরী হয়ে গেছে, ভাব্‌না কি? রাস্-তলায় কে মেয়েমানুষ পথ হারিয়ে গেছেন—তিনি তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে গেছেন!" দীনেন্দ্রনাথ কোনরূপে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিলেও তাহার ভিতর একটা কুৎসিৎ ভাব রহিয়া গেল।

শচীশের বাটী ফিরিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। বাটিতে আসিবামাত্র দীনেন্দ্রনাথ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল এবং যাহা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালাগালি দিয়া কহিল—"তুই এখনি আমার বাড়ী হ'তে দূর হ'। একটুও লজ্জা নেই?—বেহায়া!"

শচীশ আপনার ঘরে ঢুকিয়া দ্বারের অর্গল বন্ধ করিল; কোন কথা কহিল না। কেবল, স্বর্গগতা মাতার উদ্দেশে দুই চারি ফোঁটা চোখের জল ফেলিল—সেটুকু হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস!—

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন বাসন্তী-পূর্ণিমা। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মল বসন্তের আকাশে পূর্ণশশধর সুদীর্ঘ দীর্ঘিকার মধ্যস্থ পদ্মের মত শোভা পাইতেছে; চারিদিকে অগণ্য তারকা-রাজি যেন মধুপানের আশায় উন্মুখ হইয়া বিরাজ করিতেছে। সহকার-শাখায় কদাচিৎ দুই একটা কোকিল-বধূ পঞ্চম-স্বরে তাহার বিরহ-ব্যথা ব্যক্ত করিতেছে। এই গভীর রাত্রে চারি-দিকই নীরব-নিস্তব্ধ। উপরে নীলবর্ণ অনন্ত আকাশ-মধ্যে রজত-শুভ্র জোৎস্না—নিম্নে খরস্রোতা আবিলধারা ধুমাবতী। যেন তিনটী জগত; উপরে চন্দ্র—মধ্যে কোকিল—নিম্নে কে? নিম্নে ধুমাবতীর শ্বেতসৈকতে একটী যুবক দাঁড়াইয়া অনিমেষ লোচনে নদীর দিকে চাহিয়া আছে। সে সুগভীর মন্দমারুতসেবিতা জোৎস্নাস্নাতা রজনীতে যুবকের নিকট কেহই সহচর নাই—যুবক একাকী দাঁড়াইয়া ধুমাবতীর কল্লোলিত স্রোতের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে। তখন যদি কোনও ভাবুক একবার সেই যুবকের তরুণবদনের প্রতি চাহিয়া দেখিতেন—তবে বোধ হয় তিনি দেখিতে পাইতেন যে তাহার বদনে একটা কিসের ছায়া আচ্ছন্ন করিয়া আছে। নয়নদ্বয় স্থির—গম্ভীর; যেন কোন

দৃঢ়তার প্রভাবে তাহা উজ্জ্বল হইতে আরও উজ্জ্বলতর হইতেছে।

যুবক শচীশ।

এত রাত্রে শচীশ এখানে কেন? সে উত্তর আমরা কি করিয়া দিব? শচীশকে জিজ্ঞাসা কর কোন সদুত্তর পাইলেও পাইতে পার। কেন আসিয়াছে সেই জানে।

শচীশ দেখিল চারিদিকে জোৎস্নায় ভাসিয়া গিয়াছে। কেহ কোথাও নাই; সকলেই স্ব স্ব গৃহে গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

শচীশ এতক্ষণ যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সে স্থান হইতে একটু দূরে অর্থাৎ যেখানে ধুমাবতীর জল সৈকত স্পর্শ করিতেছে সেইখানে আসিল। আকাশের দিকে চাহিয়া 'দেখিল—পূর্ণিমার চন্দ্র হাসিতেছে। কিন্তু কেন? শচীশ ভাবিল,—চন্দ্র তুমি হাস কেন? আমি মরিতে যাইতেছি ইহাতে কি তোমার এত আনন্দ হইয়াছে যে তুমি তাহার বেগ সহ্য করিতে পারিতেছ না? যদি হাসিতেছ, তবে বল না চন্দ্র তোমারও হাসির কারণ কি! আমি ধুমাবতীর জলে আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে আসিয়াছি—আলিঙ্গন করিতে বিলম্ব করিতেছি—তাই কি তুমি আমায় কাপুরুষ মনে করিয়া হাসিতেছ? বলিবে না? যদি নাই বল—আমি তো আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা করিব না; আমি ডুবিব। কিন্তু ডুবিবার পূর্ব্বে তোমার হাসির কারণটা জানিয়া যাইলে ক্ষতি কি

ছিল? মরিলে আর তো জানিতে আসিব না; ডুবিলে আর তো জানিতে পারিব না। বলিবে না? না বল—নাচার!

শচীশ জলে নামিল। জল কলস্বরে কহিল—"এস আমার বুকে, প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে। শচীশ আর একটু নামিল—কহিল "ভগবান্! আমি চল্লুম। চরণে স্থান দিও।" আবার একটু নামিল।

এবারে কিন্তু শচীশের পদ স্খলিত হইল—শচীশ স্রোতের মধ্য দিয়া ধূমাবতীর জলে মিশাইয়া গেল।—

হায়! দীনেন্দ্রনাথ কি মূর্খ! শচীশের মত পুত্র আজ তাহারই ব্যবহার-দোষে ধূমাবতীর জলে আশ্রয় লইল—তাহারই তিরস্কার, তাহারই ভৎর্সনা অঙ্গের আভরণ করিয়া জলশয্যা গ্রহন করিল—পাছে কোনদিন যৌবনের মদে পিতাকে সে কোন রূঢ় কথা বলে এই ভয়ে সে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিল—তাহার এত বুক ভরা পিতৃভক্তি—এত অসাধারণ আত্মত্যাগ দীনেন্দ্রনাথ বুঝিয়াও বুঝিল না? অথবা, তাহার দোষ কি? যামিনী যে তাহার নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে! কিন্তু বুঝিবে দীনেন্দ্রনাথ এক দিন বুঝিবে! যে দিন তোমার আত্মজ্ঞান আসিবে—যে দিন সেই পরম পিতা পরমেশ্বর তোমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিবেন—সেই দিন বুঝিবে যে, শচীশ তোমার স্বপ্নের পুত্র। স্বপ্নে আসিয়া সে তোমায় সুখের ছবি দেখাইয়া গিয়াছে!—

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন বাটিতে শচীশকে কেহই দেখিতে পাইল না। দীনেন্দ্রনাথ মনে করিল—হয়ত রাগ করিয়া শেফালির নিকট চলিয়া গিয়াছে; নতুবা আর যাইবে কোথা? দীনেন্দ্রনাথ শচীশের উপর যতই বিরক্ত থাকুক না কেন—তবু সে শচীশের পিতা। হঠাৎ শচীশের এই অন্তর্দ্ধানে সে একটু চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ নবগ্রামে লোক পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু কাহাকেও পাইল না। অবশেষে সে আপনি তথায় যাইবার জন্য ইচ্ছা করিল এবং সকাল সকাল স্নানাহার করিবার কথা যামিনীকে জ্ঞাপন করাইয়া দিল। শুনিবামাত্র যামিনী কহিল—"এত তাড়া তাড়ি কেন? কাল বকেছ; বোধ হয় রাগ করে কোথায় চলে গেছে। আর যাবেই বা কোথায়? নবগ্রামেই গিয়েছে। রাগ পড়্লে আপনিই আস্‌বে এখন্।"

দীনেন্দ্রনাথ যামিনীর সকল কথাই শুনিত। এ কথা কিন্তু শুনিল না। যথা সম্ভব দ্রুতগতিতে স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া নবগ্রাম যাত্রা করিল। গিয়া শেফালীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল—"শেফালি! শচীশ এখানে এসেছে?"

শেফালী কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না ; সে হতবুদ্ধির মত কহিল—"কই, না ! কবে ? "

দীনেন্দ্রনাথ—"কাল রাত্তিরে ! "

শেফালী —"না, সেতো আসেনি ! সেই যা খোকার ভাতের সময় এসেছিল, তারপর তো আর কই আসেনি !"

দীনেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ চিন্তিতস্বরে কহিল—"তবে গেল কোথা ?"

শেফালী—"কেন বাবা ! বাড়ীতে কি কিছু বকাবকি হয়েছিল ? নইলে সে তো না বলে কোথাও যাবার ছেলে নয় !"

দীনেন্দ্রনাথ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া কহিল—"আমি আর এমন কি' বেশী বলেছি ? ছেলে পুলের ও রকম অন্যায় দেখ্‌লে কোন্ বাপে না দুটো কথা বলে থাকে ? তাইতে যদি আমার অপরাধ হ'য়ে থাকে, কি কর্‌বো বল্ ।"

শেফালী—"অপরাধ আর কি বাবা ! তবে, আপনার তাকে "দূর হয়ে যা" বলাটা ভাল হয়নি ।"

দীনেন্দ্র নাথ কোনও উত্তর দিল না ।

শেফালী— "আপনি তা'কে দূর হ'য়ে যেতে বলেছেন, সে দূর হয়ে গেছে ! আর তা'কে খোঁজবার জন্যে এসেছেন কেন ? "

বড় দুঃখ ও রাগে শেফালী পিতার মুখের উপর এমন কথা বলিতে পারিয়াছিল । কারণ, শচীশকে সে ছেলেবেলা হইতে

কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহার উপর তাহার বড়ই ভালবাসা ছিল। এরূপ অবস্থায় শেফালীর নিকট হইতে এরূপ ভর্ৎসনা বাক্য শুনিয়া দীনেন্দ্র নাথের অভিমান কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে কহিল—শচীশ গিয়াছে এইবার হইতে মনে করিব শেফালীও নিরুদ্দিষ্ট। কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখিব না। কন্যার নিকট তিরস্কার? দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি এত ঘৃন্য হইয়াছি? আচ্ছা, তোমরা থাক; আমি আর কাহারও সংবাদ লইব না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন যাবৎ দীনেন্দ্রনাথের চাকুরী নাই ; সুতরাং চাকুরীর জন্য তাহাকে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। জগতের সব কাজ না হইলে একরূপে চলিয়া যায়—কিন্তু উদরান্নের সংস্থান না থাকিলে কোন মতেই চলে না। সঞ্চিত অর্থে এতদিন চলিল ; কিন্তু এখন আর চলে না। সে একদিন যামিনীকে কহিল—"তোমার বালাগাছটী যদি দাও, তবে না হয় দিন কতক চলে ; আর সেই সময়ের মধ্যে আমিও একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখে নিতে পারি। কি বল? দেবে? নইলে আর তো কোন উপায় দেখি না। এক রকম করে তো পেট চালাতে হবে!"

গহনা বাঁধা দিবার কথা শুনিয়া যামিনী হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল ; কিন্তু মুখে কোনও বিরক্তি বা ক্রোধের ভাব প্রকাশ না করিয়া কহিল—"গহনাই বাঁধা দিতে হবে কেন? আর কিই বা গহনা আছে যে বাঁধা দেবে! থাকবার মধ্যে তো ওই একজোড়া বালা! তায় চেয়ে এক কাজ করনা কেন!"

দীনেন্দ্র নাথ সাগ্রহে বলিল—"কি কাজ?"

যামিনী—"আমায় এখন দিন কতকের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও না, সংসারটা তা'তে একটু হাল্‌কা হ'য়ে যাবে এখন!"

দীনেন্দ্রনাথ—"তা না হয় দিলুম; কিন্তু আমার উপায় কি হবে?"

যামিনী—"তুমি বেটাছেলে তোমরা হাত ঝাড়্‌লে পয়সা আন্‌তে পার। তোমার আবার ভাব্‌না কি?"

দীনেন্দ্রনাথ—"তা বল্লেই তো হবে না!"

যামিনী—"তুমি না হয় আমার সঙ্গে চলনা কেন! দাদা তো বলেছে, সেখানে গেলেই তোমার একটা চাকুরীর জোগাড় করে দেবে। কতদিন ধ'রেও তো তোমায় চিঠি লিখ্‌ছে! তুমিই গুমোর করে বসে আচ, যাচ্ছ না।"

দীনেন্দ্র নাথ দেখিল এরূপ বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকার চেয়ে যদি সেখানে গিয়াই কোন একটা কাজকর্ম্মের কিনারা হয় তবেই বা মন্দ কি? এ দিকে দীনেন্দ্রনাথের বাটী যাহার নিকট বন্ধক আছে, সেও টাকার জন্যে বিশেষ তাগাদা লাগাইয়াছে; বলিতেছে—"তোমার স্ত্রী প্রায় আজ দশ বার বছর হ'ল মারা গেছে, তখন বাড়ী বাঁধা দিয়েছ আর এ পর্য্যন্তও টাকা দেবার নাম কচ্ছ না? আমি আর কতদিন চুপ করে থাক্‌বো? এত-দিন যে বাড়ীতে বাস কর্‌তে দিয়েছি এই ঢের। এখন, হয় টাকা দাও নতুবা মানে মানে অন্য জায়গায় যাবার চেষ্টা দেখ।"

সুতরাং দীনেন্দ্র নাথ যামিনীর কথাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল। একে শচীশ নিরুদ্দেশ—তাহাতে আবার সং-

সারের এই দারুণ কষ্ট—তাহাতে আবার উত্তমর্ণের এই নির্য্যাতন—দীনেন্দ্র নাথ একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল—একটুমাত্র ভাবিবারও অবকাশ ছিল না। নচেৎ সেখানে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি থাকিলে তিনি অবশ্য বলিতেন—শ্বশুরবাটী বাস করিও না। নিজের বাস্তুভিটা যদি না থাকে—নিজের দেশে অনাহারে জীবন ত্যাগ করিও; তবু শ্বশুরালয়ে যাইয়া ক্ষীর সর নবনী খাইয়া থাকিতে পাইলেও সে আশাকে মনে স্থান দিও না।

দীনেন্দ্রনাথ কহিল,—"আমি সেখানে গেলেই যে আমার চাকরী হ'বে তারই বা কি স্থিরতা আছে? আজকালকার বাজারে কত বি, এ, এম্, এ, একটা পনের টাকা কুড়ি টাকার চাকরীর জন্যে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমি একটা মুখ্যু মানুষ;—যেতে না যেতেই আমার চাকরী হয়ে যাবে?" যামিনী জিদের সহিত কহিল—"আচ্ছা তুমি গিয়েই দেখনা বাপু!"

দীনেন্দ্রনাথ কহিল,—অবশেষে শ্বশুর বাড়ীতে সম্বন্ধীর খোসামোদ করে চাকরী যোগাড় কর্‌তে হ'বে?"

যামিনী ভ্রূকুটিপূর্ণ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—বাবা রে! কোথায় যাব গো?—বিষ নেই, তার আবার কুলোপানা চক্কর! এখানে থেকে না খেতে পেয়ে মর্‌বে তাও ভাল, তবু মানের দায়ে শ্বশুর বাড়ী যাবে না—কেমন?"

দীনেন্দ্রনাথ আর কথা না বাড়াইয়া কহিল,—"বেশ তো গো, তাইই হ'বে !"

অবশেষ, একদিন দীনেন্দ্র নাথ গৃহত্যাগ করিয়া যামিনীকে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদুবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে হরিচরণ থাকিত। দীনেন্দ্রনাথেরও বাসস্থান সেই চণ্ডিমণ্ডপে নির্দ্দিষ্ট হইল। হরিচরণ চণ্ডীমণ্ডপে একা থাকিত; বড় একটা কাহারও সঙ্গসুখ তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিত না। সে দীনেন্দ্রনাথকে পাইয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিল। মনে করিল, তাহার গঞ্জিকা সেবন কার্য্যে ভগবান্ একজন প্রধানতম সহায় মিলাইয়া দিয়াছেন! কয়েকদিন একত্র বাস করিয়া সে দীনেন্দ্র নাথের সহিত বেশ একরূপ ভাব জমকাইয়া লইল। প্রথম প্রথম দীনেন্দ্র নাথ তাহার সহিত বড় একটা কথা বার্ত্তা কহিত না; কিন্তু শেষে দেখিল যখন এক সঙ্গে একঘরে থাকিতে হইতেছে তখন কথা না কহিয়া আর কি করা যায়? সেও হরিচরণের সহিত মিশিল। কিন্তু একটী বিষয়ে সে হরিচরণের সহিত একমত হইতে পারিল না—সেটী গঞ্জিকা সেবন। তদ্ভিন্ন সে প্রায় সকল বিষয়েই হরিচরণের সহিত একমত হইয়া চলিত।

যামিনী পিত্রালয়ে আসিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। শ্বশুরালয়ে থাকা আর কারাগৃহে বাস করা যামিনীর মত স্ত্রীলোকের উভয়ই সমান। বাপের বাটী আসিয়া যে যামিনী এত আহ্লাদিত

হইল তাহার আরও একটা কারণ আছে। দীনেন্দ্র নাথের বাটীতে থাকিয়া দীনেন্দ্র নাথের প্রতি কোন আজ্ঞা-আদেশ করিলে তাহা দীনেন্দ্র নাথ হয় ত পালন না করিলেও না করিতে পারে। কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার; তাহার উপর আবার ভ্রাতাকে বলিয়া সে স্বামীর চাকুরী করিয়া দিয়াছে—মাসিক বেতন বার টাকা। এ একরকম তাহারই দান বলিতে হইবে বৈ কি! সেখানে সে দীনেন্দ্র নাথের অন্নে থাকিত; এখানে দীনেন্দ্র নাথ তাহার অন্নে আছে। যামিনী মনে করিত সেই একরূপ স্বামীর অন্নদাত্রী! সুতরাং তাহার আনন্দ না হইবে কেন? এইরূপে কিছুদিন চলিয়া গেল।

দীনেন্দ্রনাথ বেলা দশটার সময় স্নানাহার করিয়া কর্ম্মস্থলে যাইত আবার রাত্রি আটটার সময় বাটীতে ফিরিয়া আসিত। মাহিনা মাত্র বার টাকা। কিন্তু কি করিবে? এত পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন ওই দ্বাদশমুদ্রাকেই সে দ্বাদশ-শত মুদ্রা মনে করিত। দীনেন্দ্র নাথের শ্যালক যদিও তাহার চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন তথাপি তিনি তাহার প্রতি ততটা সদয় ছিলেন না; কারণ তিনি বোধ হয় ভাল জানিতেন এই দ্বাদশ মুদ্রায় কেবল দীনেন্দ্র নাথেরই কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হয়, তদ্ব্যতীত যামিনীর ভার তাঁহাকেই বহন করিতে হয়।

যাহা হউক, তিনি কোনও সন্তোষ অথবা বিরক্তির ভাব

প্রকাশ করিতেন না। এ দিকে দীনেন্দ্র নাথও কিছু বুঝিতে পারিত না! যদি কখনও বুঝিত তবে সেটা আপনার ভ্রম বলিয়া মনে করিত।

তবে, নন্দবাবু (যামিনীর ভ্রাতা) যে দীনেন্দ্র নাথকে ইহার পূর্ব্বে চাকুরীর জন্য বারংবার আহ্বান করিয়াছেন সেটী কেবল যামিনীর অনুরোধে। সে গোপনে ভ্রাতাকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিত। উদ্দেশ্য—পিত্রালয়ে বাস করিতে পাইবে। নন্দবাবু মাসে মাসে দীনেন্দ্র নাথের নিকট হইতে দশটী করিয়া টাকা লইতেন। দীনেন্দ্র নাথ জানিত ইহা তাহার এবং যামিনীর খোরাকীর টাকা। কিন্তু নন্দবাবু চোখমুখের হাবভাবে এমনই বুঝাইয়া দিতেন যে এই মাত্র দশ টাকায় তাহাদের স্বামিস্ত্রীর চলে না; তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহারই উপার্জ্জনে উদর পূর্ত্তি করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দীনেন্দ্র নাথ যে তাহা একেবারে বুঝিত না এমন নহে; তবে সে সেটাকে তত গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত না—মনে করিত এ আমার ভ্রম!

নন্দবাবুর হৃদয়ও উদার ছিল বৈকি! নতুবা তিনি ভগ্নিপতির বার টাকা মাহিনার মধ্যে দশটী টাকা লইয়া বাকী দুইটী টাকা তাহার হাতের খরচের জন্য দিতেন কেন?—

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

শচীশের সহসা এই নিরুদ্দেশে দীনেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল। পুলিশে ডাইরী করান আছে কোনও পুলিশ এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ দিতে পারিল না। অবশেষে দীনেন্দ্রনাথ যখন দেখিল যে শচীশের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না তখন আর কি করিবে? নীরব হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল।

ওদিকে শেফালী ভোলানাথকে ধরিয়া বসিল—যেমন করিয়া হউক তাহাকে শচীশের সন্ধান আনিয়া দিতে হইবে। ভোলানাথও যথাসাধ্য চেষ্টা করিল—পুলিসে জানাইল—খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিল—কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না। যখন দেখিল শচীশের কোন মতেই সংবাদ পাওয়া গেল না—তখন শেফালী একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। মনে মনে কত ঠাকুর দেবতাকে মানিল। বাটিতে চণ্ডীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, —প্রত্যহ পূজা হইত; শেফালী সেখানে গিয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিল—"মা চণ্ডি! শচীশকে মিলাইয়া দাও আমি তোমায় সওয়া পাঁচ সিকার ভোগ দিব।"

শেফালীর স্বামিভক্তি অচল ছিল। সে মনে মনে পতি দেব

তাকে স্মরণ করিয়া কহিল—প্রভু! আমি যদি সতী হই—কায়-মনোবাক্যে যদি তোমায় ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভজনা করিয়া না থাকি, তবে যেন শচীশকে আমার ফিরাইয়া পাই!

শেফালী তাহার স্বর্গগতা জননীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—মা! তুমি যদি সতী হও, তোমার পুণ্যফলে যেন শচীশকে আবার আমরা পাই!

এমন সময় কে যেন হঠাৎ তাহার মনের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—"যদি শচীশ বাঁচিয়া না থাকে!"

শেফালী চমকিয়া উঠিল। শচীশ যে নাই এ ধারণা সে মনে স্থান দিতে পারিল না। শেফালী মনে করিল—ভগবান্ কি এতদূর সর্ব্বনাশ করিবেন?

আমরা ত কাহারও মনে কষ্ট দিই নাই! আমরা তো কাহাকেও প্রতারিত করি নাই! আমরা তো কাহারও সর্ব্বনাশের চেষ্টা করি নাই! তবে ঈশ্বর কি দোষে আমাদের এ দাগা দিবেন? কি দোষে আমাদের প্রাণে এ নিদারুণ শেল বিদ্ধ করিবেন?

যদি শচীশ সত্যিই এ জগতে আর না থাকে! তবে—তবে তো ইহ জীবনে আর কখনও তাহাকে দেখিতে পাইব না! আর কখনও সে তো আসিয়া তেমনি মধুরস্বরে 'দিদি' বলিয়া ডাকিবে না! বাবা পর হইয়া গিয়াছেন—আমাদের অনাথা করিয়া চলিয়া

গিয়াছেন—থাকিবার মধ্যে—স্নেহযত্ন করিবার মধ্যে ছিল একমাত্র শচীশ। সেও আজ নাই। নাই? নাই বলিব না তো কি বলিব? যদি সে বাঁচিয়া থাকিত—তবে কি পুলিসের এত চেষ্টা বিফল হইত—খুন করিয়া নানারূপ অসৎ কাজ করিয়া লোকে পলাইয়া যায়—পুলিসের চেষ্টায় তাহারা কখন না কখন ধরা পড়ে। ইংরাজ রাজত্বে পলাইয়া গিয়া কোথায় পরিত্রাণ পাইবে? পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র স্থান আছে—যেখানে আমার মা গিয়াছেন। সে স্থান ইংরাজ রাজের ক্ষমতার অতীত। তাই বলিতেছি শচীশ এ জগতে নাই—নিশ্চয় নাই।

শেফালী একেবারে শোকে অধীর হইয়া পড়িল। স্নানাহার প্রায় একেবারে বন্ধ করিয়া শয্যাশায়ী হইল। সময়ে খাইত না—সময়ে স্নান করিত না—বাটির পরিচারিকা আসিয়া অনেক সময় তাহাকে তুলিয়া স্নান করাইত। এইরূপে শেফালীর দিন কাটিতে লাগিল।

এক কথায় বলিতে গেলে বলিব—শচীশের নিরুদ্দেশে দীনেন্দ্রনাথ জন্মদাতা পিতা হইয়া যতদূর ভাবনাকুল হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিক ভাবনাকুল হইয়াছে শেফালী!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

যামিনীর ভ্রাতা নন্দবাবুর কল্য বিবাহ হইয়াছে—অদ্য নববধূ লইয়া তিনি গৃহে আসিতেছেন। আসিবামাত্র বাটীতে একটা মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কেহ শঙ্খধ্বনি করিতেছে কেহ জলের ঝারি লইয়া ছুটিতেছে—কেহ বা বরকন্যাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ক্রোড়ে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে—কেহ বা কোন কাজ না পাইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে আপনার ব্যস্ততা জ্ঞাপন করাইতেছে।

ইত্যবসরে যামিনী দীনেন্দ্রনাথকে বাটির ভিতর ডাকাইল। দীনেন্দ্র নাথ উপস্থিত হইবামাত্র যামিনী অতি ব্যস্ততা সহকারে বলিল—"আমায় পাঁচটা টাকা দাও দিকিন্।"

দীনেন্দ্র নাথ—"কেন?"

যামিনী—"দরকার আছে; দাও না। বৌ এসেছে, বৌয়ের মুখ দেখ্তে হবে না?"

দীনেন্দ্র নাথ—"টাকা কোথায় পাব? জানত বারটী টাকা মাইনে পাই—তার মধ্যে কি বা আমার কাছে থাকে!"

যামিনী কিঞ্চিৎ রুষ্ট এবং অভিমানের স্বরে কহিল—"থাকে না কেন? কেউ কি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়।"

দীনেন্দ্র নাথ হাসিয়া কহিল—"নেয় বৈকি ! তোমার ভাইই কেড়ে নেয়।"

যামিনী রাগিয়া গেল, কহিল—"তোমার যা মুখে আসে তাই বল যে ! আমার ভাই যায়—তোমার ভালর জন্যে—আর তুমি তার নামে কলঙ্ক রটাতে পারলে ছাড় না। কলির ভাল করতে নেই—না ?"

দীনেন্দ্র নাথ তখনও গম্ভীর স্বরে কহিল—"সে ভগ্নীপতির কাছ থেকে খোরাকী বলে টাকা নিতে পারে—তাতে কিছু দোষ হ'ল না ; আমি না হয় "কেড়ে নেয়" বলেছি, তাতেই কি একেবারে এত দোষ হ'য়ে গেছে ?"

যামিনী—"দাদার তো ওই কেমন দোষ ? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে !"

দীনেন্দ্র নাথ কথাটা বুঝিল। কহিল—"তবে কি তুমি বল্‌তে চাও যে, আমি যে দশটাকা ক'রে দিই তাতে আমাদের দুজনের চলে না ? খাওয়ার ব্যবস্থাও তো আমার অবিদিত নেই !"

যামিনী—"এ খাওয়া মুখে না ভাল লাগে, অন্য জায়গায় কোথায় ভাল লাগে—যেতে পার !"

স্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনিয়া দীনেন্দ্র নাথ কিঞ্চিৎ অপমান বোধ করিল। কিন্তু কি করিবে ? যতই হউক না কেন সমস্ত সহ্য করিতে হইবে। নিজের বাটিতে স্থান পাইবার আশা নাই।

অন্য কোথাও যে বাটী ভাড়া করিয়া থাকিবে এমন সঙ্গতিও তাহার নাই। সর্ব্বোপরি এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইলে এ চাকুরী টুকুও থাকিবে না ; তখন মহা কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সে কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া কহিল—"আমি কি তা বল্‌ছি ?"

যামিনী—"তুমি যাই বল আমার জান্‌বার দরকার নেই ! এখন, আমি যা চাইছি তাই দাও !"

দীনেন্দ্র নাথ—"আমি দিব্বি ক'রে বল্‌তে পারি আমার হাতে এখন একটী পয়সা নেই।"

যামিনী—"জামাইবাবু কি তোমার চেয়ে তালেবর ? দিদিকে যৌতুক দেবার জন্যে তবু একটা নাকছাবী গড়িয়ে দিয়েছে। তোমার কি তাও দেবার ক্ষমতা নেই ?"

দীনেন্দ্র নাথ—"কি কর্‌বো ! আমার যদি ক্ষমতা না থাকে। তিনি পাঁচ রকম করে পাঁচটি ছেলে পড়িয়ে আমার চেয়ে দু'পয়সা বেশী রোজকার করেন—কাজেই তিনি ইচ্ছে কর্‌লেই দিতে পারেন ! আমি যদি না পারি ?—"

যামিনী—"এই দেখ দেখি ! কি বল্‌তে ইচ্ছে করে ! তুমি না দেবে—না দেবে। পরের দেখে তোমার চোখ টাটায় কেন ?"

দীনেন্দ্র নাথ—"এতে আর চোখ টাটানির কি দেখ্‌লে ? কথায় কথায় ও রকম কথা দুই একটা বেরিয়ে পড়ে বৈকি !"

যামিনী—"তোমার কাছে চাইলে কখনও কিছু পাইনি—আজও পাবনা, জানি। তবু একবার চেয়ে দেখলুম।' আমি নাকি বেহায়া তাই তোমার কাছে বারে বারে চাই। অন্য কেউ হ'লে চাইবার নামও মুখে আন্‌তো না।"

দীনেন্দ্র নাথ—"রাগ কর্‌লে আর কি কর্‌বো বল! থাক্‌লে কি আর দিই না? এই আঙটীটা আছে—বাঁধা দিয়া ছ'পাঁচ টাকা যা হয় তাই নাও।"

এই বলিয়া সে আপনার হাত হইতে একটি অঙ্গুরী খুলিয়া যামিনীর হস্তে দিল। যামিনী আঙটিটি লইয়া কিঞ্চিৎ নিম্নস্বরে কহিল—"আমি তো আর বাঁধা দিতে যাব না! বাঁধা দিতে হয়, তুমি বাঁধা দিয়ে আমায় টাকা এনে দাও।" অগত্যা দীনেন্দ্রনাথ অঙ্গুরীয়টি লইয়া সুপ্রভার নিকট গেল। সুপ্রভা কহিল—"আমি টাকা কোথা পাব ভাই? তবে দেখি যদি স'য়ের কাছে পাই।"

এই অঙ্গুরীয়কটী সুষমা দীনেন্দ্রনাথকে দিয়াছিল। এতদিন পরে আজ সেই অঙ্গুরী দীনেন্দ্রনাথের অধিকারের বাহিরে গেল। দীনেন্দ্র নাথ এত দুঃখের মধ্যেও—সুষমার স্মৃতি বলিয়া সেটি নষ্ট করে নাই।

ষষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

একটা প্রবাদ আছে যে "স্বভাব দ্বিতীয় চরিত্র।" মানুষ যেমনই হউক না কেন কোনক্রমেই স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। বরঞ্চ সংস্বভাব ত্যাগ করিতে পারে তথাচ অসংস্বভাব ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। হরিচরণ গাঁজা খাইত—সুবিধা পাইলে দুই-একটা দ্রব্য চুরী করিত—এখনও তদ্রূপ আছে, কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

হরিচরণ দীনেন্দ্রনাথকে দলে ভিড়াইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। অপিচ দীনেন্দ্রনাথ তাহার এই ব্যবহারের জন্য অনেক উপদেশ দিয়াছে। সে উপদেশ হরিচরণের মনে তাহার প্রতি বরঞ্চ একটা আক্রোশ জন্মাইয়াছে। কবি বলিয়াছেন ;—

"পয়ঃপানং ভূজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"

হরিচরণেরও তাহাই হইল। দীনেন্দ্রনাথ তাহার সহিত একমত না হইয়া যে উপদেশ দিতে আসিল ইহাতে হরিচরণের ক্রোধরিপু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে দীনেন্দ্রনাথের সহিত এখন আর তেমন ভাল করিয়া কথা কয় না, তাহার নিকট হইতে সে যতদূরে থাকিতে পারে ততই ভাল!

দীনেন্দ্র নাথ হরিচরণের মনের ভাবটা অনেকটা অনুমান করিয়া আপনিও সাবধান হইল। কিন্তু বাহ্যতঃ এমন কোন আকার-ইঙ্গিত দেখাইল না যাহাতে হরিচরণ তাহার মনের ভাব কোনরূপে বুঝিতে পারে।

জৈষ্ঠমাস। ভয়ানক গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সুতরাং রাত্রিতে সুপ্রভা দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া ঘুমাইতেছে, সে এমন প্রায়ই করিত। কারণ তাহার মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে প্রাচীর দিয়া ঘেরা বাড়ী—কি করিয়া চোর আসিবে? আর চোর আসিলেই বা কি লইয়া যাইবে? থাকিবার মধ্যে দুইএকখানা নিজের ও যামিনীর গহনা আছে। তাহাও সিন্ধুকের ভিতর চাবি দেওয়া। বাসন-কোশন যাহা কিছু আছে তাহাও অপর ঘরে চাবি দেওয়া থাকে। শুইবার ঘরে কেবল একখানা তক্তাপোষ আর বিছানামাদুর। চোর কিই বা চুরী করিয়া লইয়া যাইবে? সুতরাং সে রাত্রিতে দরজা জানালা খুলিয়া শয়ন করিত। সে যেমনি প্রত্যহ ঘুমায় তেমনি আজও ঘুমাইতেছে। রাত্রি প্রায় তখন তৃতীয় প্রহর অতীত হয় হয়। বাহিরে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। এমন সময় হরিচরণ চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইয়া দরজা দিয়া সুপ্রভার ঘরে প্রবেশ করিল। সুপ্রভা তখন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিল। হরিচরণ আর কাল-বিলম্ব না করিয়া হস্ত সঞ্চালন করতঃ সুপ্রভার বসনাঞ্চল খুঁজিতে লাগিল—উদ্দেশ্য সিন্ধুকের চাবি লওয়া। বিধাতা বোধ হয়

তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল ; তাহাকে আর বিশেষ কষ্ট করিতে হইল না। সুপ্রভা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাতে চাবির শব্দ হইল, হরিচরণ অমনি সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া চাবি সংগ্রহ করিল।

সেই চাবি দিয়া সিন্ধুক খুলিল—খুলিয়া দুই জোড়া অনন্ত, দুইজোড়া বালা এবং চারিটা পার্শি মাকড়ি পাইল। সে আর বিলম্ব না করিয়া সিন্ধুক বন্ধ করিল ও চাবিটা সুপ্রভার অঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়া ধীরে ধীরে গৃহের বাহির হইল।

চণ্ডিমণ্ডপে দীনেন্দ্র নাথ প্রস্রাব করিবার জন্য বাহিরে উঠিয়াছিল। দেখিল উঠান দিয়া কে একজন ছুটিয়া যাইতেছে। সে পূর্ব্বেই দেখিয়াছিল যে হরিচরণ চণ্ডিমণ্ডপে নাই, এত রাত্রে সে কোথায় যাইবে? হরিচরণের গুণাগুণ তাহার জানিতে বাকি ছিল না; সে তৎক্ষণাৎ অনুমান করিল পলায়নপর ব্যক্তি নিশ্চয় হরিচরণ। সে তম্মুহুর্ত্তে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অতি-দ্রুত গতিতে আসিয়া হরিচরণকে সাপটীয়া ধরিল এবং 'চোর' 'চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তখন হরিচরণ দেখিল নিরুপায়! সেও 'চোর' 'চোর' করিতে আরম্ভ করিল।

এমন সময়ে গ্রাম্য দারোগা চারি পাঁচজন কনেষ্টেবল সহিত রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনিও উক্ত গোলমালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি দেখিয়া কিছু অনুমান করিতে পারিলেন না। দেখিলেন দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ধরিয়া আছে

এবং দুইজনেই "চোর" "চোর" বলিয়া চীৎকার করিতেছে; আর মধ্যস্থলে একটী নেকড়া বাঁধা সাদা পুঁটুলী পড়িয়া আছে।

নন্দবাবু ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। এই একটা গণ্ডগোলে তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিসের গোলমাল জানিবার জন্য তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার দুই ভগ্নীপতি পরস্পরকে চোর অপবাদ দিতেছে, নিকটে স্থানীয় দারগা বাবু সঙ্গ-সহচর সমভিব্যাহারে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দারগা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি সতীশ বাবু!"

সতীশ বাবু—"ব্যাপার যা দেখ্‌ছি তাতে তো বুঝতে পারছি, ইহাদের মধ্যে একজন এই গহনার পুঁটুলী নিয়ে সর্‌ছিলেন অপর একজন তাতে বাধা দেয়। তবে কে এঁদের মধ্যে প্রকৃত চোর তাতো বুঝতে পার্‌ছিনা। তবে, এটা ঠিক্ যে এঁদের মধ্যে একজন নির্দ্দোষ।

নন্দবাবু—"আপনার কাকে নির্দ্দোষ বলে বোধ হয়?"

"সেইটার পরীক্ষা কর্‌তে হবে" বলিয়া তিনি একজন কনেষ্টবলকে তাহাদের বাঁধিতে আদেশ দিলেন। খোট্টানন্দন প্রভুর কথা অবিলম্বে সম্পাদন করিল। সতীশ বাবুর সহিত নন্দবাবুর বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। তিনি সতীশ বাবুকে কহিলেন—"সতীশবাবু আর ওটায় কাজ কি! হাজার হোক্ আমার ভগ্নীপতি তো! (বল্‌তেও লজ্জা করে)। এ কথা ওপর ওলাদের কাছে জানাজানি

হ'লে শেষটা আমারই মুখ পুড়বে। আপনি দয়া কর্‌লেই হ'বে, আপনি এদের ছেড়ে দিন।"

সতীশ বাবু—"ছেড়ে কি করে দেব ম'শাই আমি গভর্ণমেণ্টের মাইনে খাই, আমার এই কাজ। আমি যদি এখন এদের আপনার অনুরোধে ছেড়ে দিই তবে কেবল প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। আর আপনিও জান্‌তে পার্‌বেন না এঁদের মধ্যে প্রকৃত আসামী কে। তার চেয়েএকবার "শ্রীঘর" দেখে আসুক। আপনি কোন বাধা দেবেন না।"

অপমানে ক্ষোভে ও লজ্জায় দীনেন্দ্রনাথের মাথা কাটা যাইতে ছিল। সে সতীশ বাবুকে কহিল—"ম'শাই ধর্ম্মের জয় সকল স্থানে হয়। আপনি চলুন আমাদের কোথায় নিয়ে যাবেন; আমার সঙ্গী যদি যেতে প্রস্তুত না থাকে—আমি আছি। চলুন।"

সতীশবাবু—"রামসিং আর গণপৎ পাঁড়ে তোমরা দুজনে এদের থানায় নিয়ে যাও। আমি ভোরের বেলায় যাচ্ছি।"

এই বলিয়া তিনি দুইতিন জন কনেষ্টেবলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাটির ভিতর অনুসন্ধানে গেলেন। কারণ, তিনি পূর্ব্বেই আসামী-দ্বয়ের নিকট হইতে শুনিয়া ছিলেন যে নন্দবাবুর বাটীতেই এই চুরি হয়। কনেষ্টেবলদ্বয় দীনেন্দ্রনাথকে ও হরিচরণকে থানায় লইয়া গেল।

সতীশ বাবু বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন; যন্ত্রচালিত পুত্তলি-কাবৎ নন্দবাবুও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সুপ্রভা হরিচরণকে ফিরিয়া আনিয়া দিবার জন্য ভ্রাতার নিকট ধন্না দিয়া পড়িল। বলিল, "দাদা! তিনি সত্যই যদি এমন কাজ করে থাকেন তবে বল কি দিলে তাঁকে আবার ফিরে আনা যায়! দেখ দাদা তুমি চেষ্টা করে দেখ একবার। শুনেছি, দারগা বাবুর সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ আছে। তুমি তাঁকে একটু ধরে বস্‌লে তিনি তোমার কথা রাখলেও রাখতে পারেন।" পরে অর্দ্ধ-স্বগতভাবে কহিল — "কেনই বা এ দুর্ম্মতি হল!"

নন্দবাবু—"আরে আমি কি বল্‌তে বাকী রেখেছি? তারা কি আমার পর? তবে এখন যা বল্‌ছিস্‌ এখন আর হয় না। এখন থানায় জানাজানি হয়ে গেছে। এখন যদি তাদের খালাস কর্‌তে যাই, আমাকে নিজেই বিপদে পড়তে হবে।"

হরিচরণ যেমনই হউক না কেন সুপ্রভা তাহাকে বড় ভক্তি করিত। সে জানিত স্বামিই স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব। হরিচরণ তাহাকে এত কষ্ট দিয়াছে—কত দ্রব্য চুরী করিয়া বিক্রয় করিয়াছে; তথাপি একদিনের জন্যও সুপ্রভা তাহাকে এতটুকু অবজ্ঞা বা অনাদর প্রদর্শন করে নাই। সে বোধ হয় মনে করিত আমার

অদৃষ্ট মন্দ ; তাই স্বামী এরূপ হইয়াছেন। তবু তিনি স্বামী ; তাঁকে অযত্ন করে আমি ধর্ম্মে পতিত হই কেন? চিরদিন মানুষের কখনও সমান যায় না ; আজ তিনি মন্দ আছেন, দুদিন পরে অবশ্য ভাল হবেন। এখন যদি কোনদিন তাঁকে কোন কথা বলি—দিন চলে যাবে কেবল কথাই থেকে যাবে। তা ছাড়া, পাগল মানুষ যদি কোন দিন কোথায় রাগ করে চলে যায় তবে ভুগ্‌তে হবে আমাকেই। এখনও তবু তাঁরই জোরে মাছ খাচ্ছি মাথায় সিঁদুর পরছি ; তবু লোকে এয়োস্ত্রী বল্‌বে। নইলে আমার আর জীবনের ওয়াস্তা কি আছে ?”

স্থতরাং হরিচরণের এই বিপদে স্থপ্রভা নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। সে মনে মনে কহিল—“সে দিন যখন তিনি আমার নিকট হইতে বালা জোড়াটা চাইলেন—বল্‌লেন্‌, স্থপ্রভা এখন তোমার বালা দু'গাছা দাও বন্ধক রেখে কিছু টাকা আনি, আমার শরীরটা ভাল নয়, চিকিৎসা করতে হবে। আবার সময় হলে উত্‌রে এনে দেব। আমি হতভাগী কেন দিলুম না? আমি যদি তখনই তাঁকে ওই ছাই-ভস্মটা দিতুম তাহোলে ত আর আজ তাঁর এ বিপদ ঘট্‌তো না ? এখন আমি গয়না নিয়ে কি কর্‌বো ? এখন গয়না প'রে কা'কে দেখাব ? স্ত্রীলোকের গয়না পরা যখন স্বামীর জন্যে—আর যখন আমার স্বামীই আমার কাছে নেই— তখন আর ও গয়না নিয়ে কি হবে ?”

কিন্তু যামিনী সুপ্রভার ভগ্নী হইলেও সে ততটা—ততটা কেন দীনেন্দ্র নাথের জন্য আদৌ বিচলিত হইল না। বেশ হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল; মনে কোন ভাবনা চিন্তা নাই। সুপ্রভা যদি কোন দিন জিজ্ঞাসা করিত—"যামিনী! পোড়ারমুখি! তোর কি একটুও প্রাণ কাঁদে না?"

যামিনী খরস্বরে উত্তর দিত—"বালাই! আমার মন কাঁদ্‌তে যাবে কেন? যে যেমন কাজ করেছে সে তেমনি ফল ভোগ কর্‌বে। আমি কেঁদে আমার দুঃখের বোঝা ভারী করি কেন?"

সুপ্রভা আশ্চর্য্যের সহিত কহিত—"কালামুখি! ও কথা মুখে আনিস্ কি করে?" স্বামীকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, আর তুই বেশ আমোদে হেসে খেলে বেড়াচ্ছিস?"

যামিনী—"কেনই বা বেড়াব না? কার ধার করে খেয়েছি?" আর পুলিশের কথা? পুলিশ তো তাকে খেয়ে ফেল্‌বে না? দোষ করেছে শুধ্‌রে দেবে। তাতে আর ভাবনার কি আছে?"

সুপ্রভা—"তাই ব'লে প্রাণকে প্রবোধ দিতে পারিস্ তো?"

যামিনী—"তা' কেন পার্‌বো না? তোমার মতন প্রাণ আমার অত কোমল নয় যে একটুতে অম্‌নি গ'লে যাবে!"

এ স্থলে স্বভাবতঃই একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—সুপ্রভা এমন যামিনী এরূপ কেন? একই বিধাতার সৃষ্টি নৈপুণ্য। তিনি যে মেঘে জল দিয়াছেন, সেই মেঘেই বজ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে

ফুলে সুমধুর গন্ধ দিয়াছেন, আবার সেই ফুলেই কীটের সৃষ্টি করিয়াছেন। চন্দ্রকে এমন স্নিগ্ধ সৌম্য শান্ত করিয়া সৃজন করিয়াছেন আবার সেই চন্দ্রের সাথে কলঙ্ক দিয়াছেন। সুতরাং যামিনী সুপ্রভার ভগ্নী হইয়া সে কেন এমন হইল এ কথা কে বলিতে পারে? যদি কেহ কারণ দেখাইয়া প্রমাণ করিতে পারেন যে এই এই কারণে যামিনী সুপ্রভার সহোদরা হইলেও এরূপ হইয়াছে; তবে বিজ্ঞ হইলেও তিনি আমাদের মতে অজ্ঞ, বিদ্বান হইলেও মূর্খ। কেননা, ওরূপ কারণ দেখান মূর্খতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্য আসামীদ্বয়ের বিচার হইবে। বিচারালয়ের সুপ্রসিদ্ধ খ্যাতনামা বিচারক শ্রীযুক্ত বাবু ভবতারণ ঘোষ বাহাদুরই বিচার করিবেন। ভবতারণ বাবু একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মভীরু লোক। বিচারের সময় পাছে ধর্ম্মের কোন অপলাপ হয় এই ভয়েই তিনি সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন। অথচ তাঁহার মত অপক্ষপাতী বিচারক এ পর্য্যন্ত হয়েন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাহা হউক, যথাসময়ে দীনেন্দ্র নাথের ও হরিচরণের ডাক হইল। চারিজন কনেষ্টেবল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আদালতের বহিস্থ কোন আম্রবৃক্ষের তলায় তাহারা উপবিষ্ট ছিল। হরিচরণ একজন কনেষ্টেবলকে এক ছিলিম গাঁজা আনিয়া দিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছিল; কিন্তু রাজভক্ত কর্ম্মচারী রাজকার্য্যের অবমাননা বিবেচনায় তাহার কথায় ভ্রুক্ষেপ করিতেছিল না। এমন সময় একজন দীনেন্দ্র নাথের ও হরিচরণের নাম ধরিয়া ডাকিল। কনেষ্টেবল চতুষ্টয় তাহাদিগকে লইয়া বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিল।

হলফ পড়ান হইল। তখন বিচারক হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি বাপু!"

হরিচরণ—"আজ্ঞে, শ্রীহরিচরণ সরকার। জাতি কায়স্থ। পেশা অধ্যাপনা। নিবাস শ্বশুরালয়—"

হরিচরণের উত্তরে আমাদিগের কমলাকান্তকে মনে পড়িল। তবে প্রভেদের মধ্যে এই, যে কমলাকান্ত ছিল অহিফেন সেবী আর আমাদের হরিচরণ গঞ্জিকাসেবী। এতদ্ভিন্ন উভয়ের সাদৃশ্য বড় পৃথক নহে।

যাহা হউক, এই অযাচিত উত্তরে বিচারক মহোদয়ের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে লোকটা কিছু বায়ুরোগগ্রস্ত।

বিচারক—"এ চুরী করেছে কে?"

হরিচরণ—"আপনার দেখে কি বোধ হয়?"

বিচারক—"আমার যাই বোধ হ'ক না কেন; এ চুরী করেছে কে আমি তোমার মুখে শুন্‌তে চাই।"

হরিচরণ—"আজ্ঞে, এই ভদ্রলোক—আমার ভায়রাভাই।" এই বলিয়া সে দীনেন্দ্র নাথকে দেখাইয়া দিল।

নিকটস্থ দর্শকবৃন্দ সকলেই হাসিয়া উঠিল।

বিচারক—"তাহোলে তুমি চুরী করনি—কেমন?"

হরিচরণ—"হুজুর, ভদ্দর লোকের ছেলে কি চুরী করে? চুরী করেছেন এই মহাত্মা।"

বিচারক—"কি করে জান্‌লে যে এই ব্যক্তি চুরী করেছে?"

হরিচরণ—"আজ্ঞে, রাত্তির বেলায় ভয়ানক গরম বলে আমি

চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় শুয়ে ছিলুম। এমন সময়ে দেখি যে একটা লোক উঠান দিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে। তখন তো আর মনে করি নি যে আমার ভায়রাভাইয়ের এই কাজ! আমি অম্‌নি একলাফে ছুটে গিয়ে পাঁজাকোলা করে ধরে ফেল্লুম! তারপর যাই ধরা, আর অমনি এ লোকটা গয়নার পুঁটলীটা উঠানে ফেলে দিয়ে আমায় উল্‌টে জাপটে ধরে 'চোর' 'চোর' বলে হাঁকৃতে লাগলো। তারপর কি হয়েছে দারোগা বাবু জানেন।"

বিচারক—"তাহোলে তুমি চুরী করনি?"

হরিচরণ—"না হুজুর! আমি চুরী কর্‌বো কেন? বিশেষতঃ আমার পরিবারের গহনা, যখন চাইলেই পাব, তখন চুরী কর্‌তে যাব কেন?"

বিচারক—"এ বিষয় তোমার আর কিছু বল্‌বার নেই?"

হরিচরণ—"আর কি বল্‌বো? এখন, আপনার যা' বিচার হয় করুন।"

তখন বিচারক দীনেন্দ্র নাথের প্রতি কহিলেন—"তোমার নাম কি?"

দীনেন্দ্র—"আজ্ঞে শ্রীদীনেন্দ্র নাথ মিত্র।"

বিচারকের পার্শ্বে একটী যুবক উপবিষ্ট ছিল। সে পূৰ্ব্বাপর দীনেন্দ্র নাথের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া যেন কি দেখিতে-ছিল; বোধ হয় ভাবিতেছিল এ ব্যক্তিকে কোথায় দেখিয়াছি।

কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি তাহাও ঠিক অনুমান করিতে পারিতেছে না। সে হঠাৎ শ্রী"দীনেন্দ্র নাথ" নামটা শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ চমকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখে কোনও প্রকার ভাব প্রকাশ না করিয়া প্রোৎসুক শ্রবণে দীনেন্দ্র কি বলে তাহারই শ্রবণের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পিতার নাম?"

দীনেন্দ্র—"আমার পিতার নাম শ্রীমহিম চন্দ্র মিত্র।"

বিচারক—"নিবাস!"

দীনেন্দ্র—"চন্দ্রহাট।"

যুবক তখন সরিয়া আসিয়া বিচারকের কানে কানে কি একটা কথা বলিল। বিচারক তাহাতে একবার দীনেন্দ্রনাথের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন এবং পরে কহিলেন—"এ বিষয় তোমার কি বল্‌বার আছে?"

তখন দীনেন্দ্র নাথ কহিল—"আমার যা বল্‌বার তা (হরিচরণের দিকে দেখাইয়া) এই ব্যক্তিই সমস্ত বলেছে। আমার এজাহার মিথ্যে করে আপনাকে বলেছে। হুজুর, আমি নিরীহ নির্দ্দোষী ব্যক্তি; ধর্ম্মের জয় সকল স্থানে হয়; বিশেষ যখন এটা ধর্ম্ম-মন্দির। হুজুর ন্যায়ের বিচার করুন। ন্যায় বিচারে আমাকে যে শাস্তি দিবেন, আমি তাই মাথা পেতে নিতে সম্মত আছি।"

বিচারক কহিলেন—"আজ তোমাদের কোনও বিচার হ'বে না। পরশ্ব দিন বেলা ১০ টার সময় তোমরা আবার আদালতে এসো। আর একটা কথা, আজ সন্ধ্যাবেলা তুমি আমার বাড়ীতে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো। তোমায় কিছু বল্‌বার আছে।"

সহসা তিনি দীনেন্দ্র নাথকে তাঁহার বাটীতে সাক্ষাত করিতে বলিলেন কেন? দীনেন্দ্র নাথ ভয়ানক ভীত হইল। সে ভয়-ব্যাকুল চিত্তে কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"হুজুর! আপনার বাড়ীর সন্ধান আমি কি করে পাব?"

বিচারক—"এই চাপরাসী তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ী দেখিয়ে দেবে। সে জন্য তোমার চিন্তা কি?"

দীনেন্দ্র নাথ ভাবিল নিশ্চয়ই একটা গুরুতর কিছু হইবে। নতুবা বাটীতে যাইতে বলিবেন কেন? যাক্, যখন 'চোর' বদনাম নিয়েছি তখন এর বেশী কি অপমান আছে? সে শুধু "যে আজ্ঞা" বলিয়া উত্তর সারিয়া দিল।

তখন, বিচারক মহোদয় দীনেন্দ্রনাথকে ও হরিচরণকে বিদায় দিয়া কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হইলেন।

উনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

ভবতারণ বাবুর উদ্যানে যে কাল জলপূর্ণ সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা আছে সেই দীর্ঘিকার চত্বরে বসিয়া একটি বালিকা আমাদের বিচারালয়ে বিচারকের পার্শ্বোপবিষ্ট সেই যুবকের হাত দুইখানি ধরিয়া কহিল "—কই, প্রদীপ দাদা! আমায় যে মালা গেঁথে দেবে বলেছিলে, দিলেনা? আজ কিন্তু ছাড়বো না! এই দেখ, ঘাটের ধার থেকে কতগুলো বকুল ফুল তুলে এনেছি। কই, মালা গেঁথে দাও!" যুবক কিছু অন্যমনস্ক ছিল; বালিকা যে এতগুলি কথা বলিল সে তাহাতে কোন উত্তর দিল না।

তখন বালিকার কিছু অভিমান হইল। সে কোঁচড়ের ফুলগুলি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া কহিল—"প্রদীপ দাদা! কথা কহিলে না? আমার ওপর রাগ করেছ? বল না।" যুবকের নাম প্রদীপ-কুমার অথবা এইরূপ একটা কিছু হইবে। নামটা কিছু ব্রাহ্ম ধরণের হইল; কিন্তু কি করিব? তাহা বলিয়া প্রকৃত নাম গোপন করিতে পারি না ত! যাহা হউক সে বালিকার কুসুমপেলব হাত দুইখানি ধরিয়া কহিল—"তুমি তো দিন রাত্তির ভাবো! রাতদিন ভাবতে তোমার ভাল লাগে?"

প্রদীপ—"কি ভাবি বল দেখি, জ্যোৎস্না!"

জ্যোৎস্না—"তা আমি কি করে জান্‌বো ?"

প্রদীপ—"ভাবি আমার জীবনের কথা। আমার জীবনটা বড় কষ্টকর। যাই হোক, তুই এক পাতা পড়েচি—তবুও একটা চাকুরী জোগাড় কত্তে পার্‌লুম না। বাবার স্কন্ধে ব'সে ব'সে আর ক'দিন খাব ?"

জ্যোৎস্না কথাটায় বড় ব্যথিত হইল ; কহিল—"তুমি চাকুরী কর না ব'লে কি বাবা রাগ করে ?"

প্রদীপ—"না, তা করেন না। তবু, আমার নিজের একটা বিবেচনা আছে ত ?"

জ্যোৎস্না কহিল "আমায় ওই সমস্ত কথা ব'লে ভুলাচ্ছ ? তা শুন্‌বো না। আজ আমায় একটা মালা গেঁথে দিতেই হবে !" এই বলিয়া সে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বকুল ফুলগুলি কুড়াইয়া প্রদীপকুমারের সম্মুখে জড় করিয়া দিল। অভিমান ভরে যে ফুল জ্যোৎস্না ফেলিয়া দিয়াছিল সে গুলি আবার কুড়াইয়া লইতে সে একটুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিল না। তাহার কারণ বোধ হয় সে প্রদীপকুমারকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিত। প্রিয় ব্যক্তির প্রতি অভিমান সহজেই হইয়া থাকে, আর অভিমান দূর হইতেও বেশী সময় লাগে না। জোৎস্না যখন পড়িত তখন প্রদীপ না পড়া বলিয়া দিলে তাহার চলিত না। জ্যোৎস্নার মস্তিষ্কটা তেমন উর্ব্বর ছিল না ; সে বার বার পড়া ভুলিয়া যাইত।

প্রদীপকুমারও বিরক্ত না হইয়া ছাত্রীকে এক বিষয় বার বার বলিয়া দিত। কাজেই, তাহার অধ্যাপনা ভিন্ন, জ্যোৎস্না আর কাহারও অধ্যাপনা পছন্দ করিত না।

যাহা হউক, প্রদীপকুমার যখন দেখিল, যে মালা গাঁথিয়া না দিলে জোৎস্না তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না, তখন অগত্যা সে মালা গাঁথিতে বসিয়া গেল। ওদিকে জ্যোৎস্নাও ঘাটের চাতাল হইতে ফুল কুড়াইয়া কুড়াইয়া তাহাকে আনিয়া দিতে লাগিল।

যখন মালা গাঁথা শেষ হইল তখন প্রদীপকুমার বলিল—"এই মালা হয়েছে?" জ্যোৎস্নার মালা পছন্দ হইল না; সে কহিল—"ওকি হল? ওযে বড় সরু হ'ল! ও আমার চাই না। তুমি নিজে গেঁথেছ তুমি নিজে পর।" এই বলিয়া সে মালাটি প্রদীপের গলদেশে পরাইয়া দিল।

সে হাসিয়া কহিল—"তুমি বড় অন্যায় কাজ কর্‌লে জ্যোৎস্না!" জ্যোৎস্না অবাক হইয়া কহিল—"কেন?"

প্রদীপ তদ্রূপ হাস্যমুখে কহিল—"গলায় মালা পরিয়ে দিলে কি হয় জাননা?"

জ্যোৎস্না—"ভায়ের গলায় বোন্ যদি মালা পরিয়ে দেয়, তবে কি হয়?"

সে এরূপ উত্তরের আশাও করে নাই। জ্যোৎস্না জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল স্বচ্ছ—জ্যোতির্ম্ময়ী। তাহার মুখে এরূপ বিজ্ঞের

উক্তি ? প্রদীপ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"জান না ? মালা পরিয়ে দেওয়া ভালবাসার লক্ষণ।"

জ্যোৎস্না অত শত বুঝে না। সে অমনি বলিয়া ফেলিল—"তবে কি বল, আমি তোমায় ভাল বাসিনা প্রদীপ দাদা ?"

জ্যোৎস্নার কথায় প্রদীপকুমারের হৃদয়ে সহস্রতন্ত্রী একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—শিরা উপশিরায় রক্তস্রোত যেন আরও প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া কহিল—"দাদাবাবু! দিদিবাবু! তোমাদের দুজনকে বাবা বাহিরের ঘরে ডাক্‌ছেন।"

প্রদীপ ও জ্যোৎস্না উভয়ে পিতৃসমক্ষে উপস্থিত হইল। দেখিল একটা সোফায় ভবতারণ বাবু অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় শুইয়া আছেন, নিকটে দীনেন্দ্র নাথ একখানি চেয়ারে বসিয়া আছে। জ্যোৎস্না দীনেন্দ্র নাথকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না; কিন্তু প্রদীপকুমার দীনেন্দ্রকে দেখিয়াই চিনিল যে এই সেই আসামী।

ভবতারণ বাবু দীনেন্দ্র নাথকে কহিলেন—"আপনার বিষয় আমি অনেক ভেবে দেখ্‌লুম। ভেবে শেষে এই সিদ্ধান্ত কর্‌লুম যে আপনার শাস্তি ভয়ানক গুরুতর।"

দীনেন্দ্র নাথ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে অতি মৃদু-কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"আমার কি গুরুতর শাস্তি আদেশ করেন হুজুর ?"

ভবতারণ বাবু—"যাবজ্জীবন কারাবাস! হরিচরণের হয়ত দুই এক বৎসর কারাবাস যন্ত্রনাই যথেষ্ট শাস্তি। আপনি যতদিন বাঁচবেন—ততদিন কারাবাস।"

দীনেন্দ্র নাথ যাবজ্জীবন কারাবাসের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া ভবতারণ বাবুর পদতলে লুটিয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"তার চেয়ে আমার প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিন হুজুর! সে যন্ত্রণা ক্ষণেকের যন্ত্রণা; তারপর অনন্ত সুখ।" ভবতারণ বাবু দীনেন্দ্র নাথকে হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন—"এতেও তোমার অনন্ত সুখ।" এই বলিয়া সে এক হাতে প্রদীপের হাত ও অপর হাতে জ্যোৎস্নার হাত ধরিয়া দীনেন্দ্র নাথকে বলিলেন—"এই নিন্ আপনার কারাগার, এই-খানে যাবজ্জীবন আবদ্ধ থাকুন।"

দীনেন্দ্র নাথ বিস্মিতের ন্যায় কহিল—"সেকি হুজুর!"

ভবতারণ বাবু।—ব্যস্ত হবেন না; সব জান্‌তে পার্‌বেন্! এখন, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন কর্‌বো—যথাযথ উত্তর দেবেন।

দীনেন্দ্র নাথ কহিল—"বলুন।'

ভবতারণ বাবু—"আপনার দুটি বিবাহ।"

দীনেন্দ্র—"আজ্ঞে হাঁ।"

ভবতারণ বাবু—"আপনার প্রথমা স্ত্রী সুষমা স্বর্গগতা হলে

দিন কয়েক পরে আপনি যামিনী নাম্নী কোন রমণীকে বিবাহ করেন।"

সেই মুহূর্ত্তে যদি সেই গৃহে বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় দীনেন্দ্র নাথ তত চমকিত হইত না; যতদূর পরিমাণে চমকিত হইল ভবতারণ বাবুর কথা শুনিয়া। ভাবিল, এ সব কথা, এত গুহ্য কথা এমন কি আমার স্ত্রীদ্বয়ের নাম পর্য্যন্ত ইনি জানিলেন কিরূপে? অবশ্য কোন গূঢ় রহস্য আছে। সে কহিল —"আজ্ঞে হাঁ আপনার কথা সমস্ত সত্য।"

ভবতারণ বাবু—"আপনার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্ররোচনায় আপনি একদিন আপনার একমাত্র পুত্রকে ভয়ানক তিরস্কার করেন। সেই দুঃখে সে ধুমাবতী নদীতে ঝাঁপ দেয়। আমি কোন কার্য্যব্যপদেশে ভিন্ন জিলায় গিয়েছিলুম। ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রে নৌকা করে সেইখান দিয়ে আস্‌ছিলুম। হঠাৎ জলে একটা কি পড়বার মত শব্দ শুনে আমার চাকরদের দেখ্‌তে বলি। তা'রা দেখ্‌লে যে একটা মানুষ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর তাকে তুলে নিয়ে নৌকায় এনে অনেক সেবাশুশ্রূষা কর্‌বার পর তা'র জ্ঞান সঞ্চার হলো। এই সেই আপনার ছেলে, আর এই আমার মেয়ে জোৎস্না আপনার ভাবী পুত্রবধূ।"

দীনেন্দ্র নাথ লাফাইয়া উঠিয়া শচীশকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল—"শচীশ! শচীশ! এতদিন কোথা ছিলি বাবা!"

শচীশও নয়ন জলে পিতার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল।

এ বড় শুভ মুহূর্ত্ত !

দীনেন্দ্র নাথ এতক্ষণে কারাবাসের অর্থ বুঝিল। কহিল— "শচীশ, বাবা তুই মরে গিয়েছিলি ; আবার এই মহাত্মার কৃপায় তোকে পেলুম।" দীনেন্দ্র নাথ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া কেবল বলিতে লাগিল—"ভগবান্। তোমার কৌশল অসীম বৈচিত্রময়। আমরা ক্ষুদ্র মানব কি বুঝবো ? নইলে আজ আমাদের এরূপ ভাবে মিলন হয় ?"

—

পরিশিষ্ট

বিচারের পর হরিচরণই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইল। তাহার এক বৎসরের কারাবাসের আদেশ হইল। এদিকে শুভদিনে শুভলগ্নে শচীশের সহিত জ্যোৎস্নার বিবাহ হইয়া গেল। পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে শচীশ বাঁচিয়া আছে এই ভয়ে শচীশ প্রথমে ভবতারণবাবুকে নিজের প্রকৃত নাম বলে নাই। সে দিন আদালতে শচীশ দীনেন্দ্রনাথকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। পিতার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার মনে বড়ই আঘাত লাগিল। বাটীতে আসিয়া সে তখন ভবতারণ বাবুকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়া কহিল—"বাবা, আসামী আমার সেই জন্মদাতা পিতা।"

জ্যোৎস্নার বিবাহে ভবতারণ বাবু নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুকস্বরূপ দান করিলেন। দীনেন্দ্রনাথ তাহার কিয়ৎ অংশ দিয়া আপনার বসতবাটীখানি উতরাইয়া লইল।

যামিনীকে দীনেন্দ্রনাথ আর লইয়া আসিল না। মাসে মাসে দশটাকা করিয়া খোরাকী পাঠাইতে লাগিল।

শেফালী শচীশকে পাওয়া গেছে শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইল। তাহার দেবতার যাহা যাহা মানসিক ছিল তাহা সমস্তই

দিল। সে বড় জোর করিয়া বলিয়াছিল—"আমি যদি সতী হই কায়মনোবাক্যে যদি পতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভজনা করিয়া না থাকি, তবে যেন শচীশকে আবার ফিরাইয়া পাই।" ভগবান্ তাহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন।

শচীশের বিবাহেও আসিয়া সে অনেক আমোদ আহ্লাদ করিয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

১। অমরধাম।

স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

উত্তম কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা. সুন্দর বহু চিত্র শোভিত শিল্কের বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা মূল্য ১৷৷০ টাকা মসৃণ প্যাডে রাজ সংস্করণ মূল্য ২৲ টাকা।

চমকপ্রদ ঘটনা জড়িত বিচিত্র কাহিনী অমর কণ্ঠের কমনিয় সঙ্গিত আবেগময়ী ভাষার নিপুণতা পাঠে সকলি জাগিয়া উঠিবে।

২। অদৃষ্ট লিপি।

(উপন্যাস)

এই উপন্যাস পড়িতে পড়িতে নিশা ঘন তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যত পথে অনির্দ্দিষ্ট চঞ্চল বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে সাহস পাইবেন আমাদের দেশের নীতি প্রাচীন সমাজ যে সমাজের রীতি-নীতি আচার আচরণ কিরূপ ছিল সেকালের একালের মানুষের কত প্রভেদ দেখিতে পাইবেন, এই অদৃষ্ট লিপিতে কাহার অদৃষ্ট কিরূপ ফুটিয়া উঠিল, তাহার বিচার পাঠক করিবেন নব্যভারত ভারতবর্ষ সকলেই এক বাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। অতি মনোরম রেশমে বাঁধাই মূল্য ১।০।

৩। পথহারা পথিক।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম্মের নানা বিষয়িণী
আলোচনা পূর্ণ অপূর্ব্ব তত্ত্ব গ্রন্থ।

যদি সংসারে সুখ চান, শান্তি চান, জীবনে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে চান, তাহা হইলে এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখুন। আজীবন সাধন করিয়া মহাসাধক প্রাণে যে সকল অনুভব করিয়াছেন এই গ্রন্থে তাহারই অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবেন। সুন্দর সিল্ক বাঁধাই মূল্য ১৲ এক টাকা।

৪। প্রীতি।

ভক্তি ভাবপূর্ণ গীতি কাব্য।

ভাব উচ্চ, ভাষা সরল অথচ মধুর প্রাণের মাঝে ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়। (হাই কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি জাষ্টিস স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা।

গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১। মালা, ২। ওপারের কথা, ৩। হিন্দু উপনিবেশ, ৪ সাধক দিনবন্ধু।